ড. মারওয়ান ইব্‌রাহীম আল-কায়সি

ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ

ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা
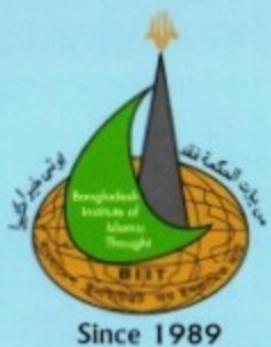
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ
ইসলামি আদবের দিক নির্দেশনা

মূল
ড. মারওয়ান ইব্‌রাহীম আল-কায়সি

অনুবাদ
শেখ এনামুল হক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রকাশকের কথা

ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমগ্র বিশ্বকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল প্রায় আট'শ বছর। বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতিতে ইসলামি সভ্যতার অবদান কম নয় মোটেই। অষ্টম শতকে ইউরোপের অন্ধকার যুগে মুসলিম স্পেনের জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকায় অবগাহন করে ইউরোপ নবজীবন লাভ করে এবং শুরু হয় ইউরোপের নব উত্থান।

নৈতিকতা এবং আচরণ– এ দুই-ই মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামে এ বিষয়গুলো সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতা ও আচরণের উপাদানগুলোর চর্চা ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবনকে সুন্দর, সাবলীল ও গতিময় করে। এসবের আর্থিক মূল্য খুব বেশি না হলেও সামাজিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামি সমাজে নৈতিকতা ও আচরণের ছোট খাট বিষয়কেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় বলে ইসলামি সমাজ এবং সংস্কৃতি সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও শোভা লাভ করেছে। যে সমাজে নৈতিকতার কোন বাছ-বিচার নেই, সে সমাজ অত্যন্ত বিশৃংখল। বইটির লেখক মাওরয়ান ইব্রাহীম আল কায়সি ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি গ্রন্থাবদ্ধ করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামি কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে যথার্থ অবদান রেখেছেন।

সংস্কৃতির পরিধি বিরাট। লেখকের এ পুস্তিকাটি মূলত: তাঁর দেশের সাংস্কৃতিক আবহে লেখা। এ জন্য বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে কোন কোন বিষয় বৈসাদৃশ্য মনে হতে পারে। কিন্তু তা মূল ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়– এ বিষয়টি পাঠককে বিবেচনায় রাখতে হবে।

বইটির অনুবাদক সাংবাদিক শেখ এনামুল হক সাহেব অনেক পরিশ্রম করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে এ বইটি তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ জন্য আমরা তাঁকে মোবারকবাদ জানাই। অনূদিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজটি করেছেন ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান সাহেব। এ জন্য আমরা তার কাছেও কৃতজ্ঞ। ব্যাপক পাঠক– চাহিদার প্রেরিক্ষতে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এতে আমরা পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নেয়ার চেষ্টা করেছি। যাদের উদ্দেশ্যে আমাদের এ প্রচেষ্টা, বইটি তাঁদের কাজে আসলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

সেপ্টেম্বর, ২০১০।

প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

অনুবাদকের কথা

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের ভূমিকা আজ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। ইসলামি সভ্যতার সেই স্বর্ণযুগের আলোকে নতুন করে বিশ্ব সভ্যতা পুনর্গঠনে মুসলমানদের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বহু দিন হল। প্যান ইসলামি যুগের স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম জামাল উদ্দিন আফগানির স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা আজ মুসলিম বিশ্বে জোরদার।

ইসলামের শাশ্বত আদর্শে সার্বিক সমাজ গঠনের ঢেউ লেগেছে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র। মুসলমানরা আজ ইসলামি জীবন বিধানের আলোকে নিজেদের জীবন রাঙিয়ে তোলার জন্য উন্মুখ। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সুদমুক্ত ব্যাংক বীমা আজ বিশ্বের সর্বত্র বাস্তবরূপ লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বসভ্যতার পুনর্গঠনেও ইসলাম যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ড. মারওয়ান ইব্রাহিম আল কায়সির লিখিত *Morals and Manners in Islam A Guide to Islamic Adab* বা "ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ: ইসলামি আদবের দিক নির্দেশনা"–নামে বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পেশ করা হল। আমার জানামতে বাংলাভাষায় এ ধরনের বই নেই বললেই চলে। সুতরাং গ্রন্থখানি বাংলাভাষী পাঠকদের ইসলামি জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

১৯৯৮ ইং   শেখ এনামুল হক

মুখবন্ধ

ইতিহাসের সূচনা থেকেই মানব সমাজ এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ের গোত্রীয় সমাজেও ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক পরিচালনার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে প্রচলিত পতে হোতেপ–এর নির্দেশনাবলিতে (The Instructions of Ptah Hotep) সুষ্ঠু আচরণ সম্পর্কে পুত্রের প্রতি পিতার নির্দেশনাবলি জানা যায়। প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব বিধিবিধান ও আচরণ মেনে চলেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের আচরণবিধি ব্যাপক পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি কোন এক জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রেও একই সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা পরিবর্তিত হয়েছে। মুসলমানদের বেলায়ও এটা সত্য যে, মুসলিম বিশ্বের দৈনন্দিন জনজীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামি আদবের বিভিন্ন দিক এখনও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তথাপি, এটাও সত্য যে, বহিরাগত ভাবধারা ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করেছে। ইসলামি ভাবধারার সাথে স্বল্প যোগাযোগের ফলেই এ ধরনের প্রভাব পড়েছে। তবে এ বিষয়ে কোন প্রকার উপযুক্ত গ্রন্থ না থাকায় বিদেশী ভাবধারা প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এ ধরনের গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনের নিরিখেই এই রচনার প্রয়াস। সম্ভাব্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কাছে ইসলামি আদবের বিস্তারিত দিক তুলে ধরা এর উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক এবং অব্যাহত পারস্পরিক আন্তঃযোগাযোগের ফলে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে পশ্চিমা আচরণের কতিপয় ধারার আমদানি ঘটেছে। কিন্তু এই আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠার আগেই নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিতির দরুণ ইসলামি জীবনবিধান অনৈসলামিক ভাবধারার প্রভাবাধীনে পড়ে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামের মৌলিক সূত্র আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মুসলমানদেরকে তাদের আচরণকে ইসলামিকরণ করতে হবে। তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ও ঐতিহাসিক ইসলাম এবং ইসলাম ও অইসলামের মধ্যকার পার্থক্য জানতে হবে। প্রাথমিক ইসলামে প্রচলিত অনেক

আচার-আচরণ, যা এখনও মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের পর, যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রাধান্য থেকে ইসলামি সমাজকে মুক্ত করার পথ সুগম করতে হবে।

সবকালে এবং সর্বত্র মুসলিম শিশুদেরকে ইসলামি আদব অনুসারে জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। আশা করা যায়, এই গ্রন্থখানি ইনশাআল্লাহ উল্লিখিত শূন্যতা পূরণে সহায়ক হবে এবং বিশেষ পরিস্থিতি বা সময়ে কি ধরনের আদব লেহাজ প্রদর্শন করা উচিত সেজন্য একটি সহজবোধ্য পুস্তিকা হিসেবে এটি কাজ করবে। প্রসঙ্গের (Reference) সুবিধার জন্য প্রতিটি অধ্যায় পয়েন্টভিত্তিক সাজানো হয়েছে এবং সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন পরিচ্ছেদের সাধারণ আলোচ্যসূচির ক্ষেত্রে বেশকিছু পয়েন্টের পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

সবশেষে এই গ্রন্থের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে পরামর্শ দিলে লেখক পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

১৯৮৬ ইং।

ড. মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি
মানবিক বিভাগ
ইয়ারমুক বিশ্ববিদ্যালয়, ইরবিদ, জর্দান।

সূচিপত্র

সূচনা

'আদব' একটি আরবি পরিভাষা যার অর্থ হচ্ছেঃ প্রথা। জনগণের কাছে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত অভ্যাস, যা এক ধরনের লেহাজ বা আচরণ নির্দেশ করে।[১]

ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম দু'শতাব্দীর মধ্যে 'আদব' (adab) পরিভাষাটিতে নৈতিক ও সামাজিকতার সম্পর্ক ছিল। মূল 'দব' এর অর্থ হচ্ছে ঃ বিস্ময়কর জিনিস অথবা প্রস্তুতি বা ভোজ। এই অর্থে 'আদব' এর ল্যাটিন সমার্থক হচ্ছে urbane, যার অর্থ সভ্যতা, সৌজন্য, নগরীর কৃষ্টি। এর বিপরীত অর্থঃ বেদুঈনদের অশিষ্টতা।[২] সুতরাং কোন কিছুর আদব এর অর্থ হচ্ছে, ঐ জিনিসের ভাল দিক। আদবের বহু বচন হচ্ছে ঃ adab। সুতরাং Adab al-Islam এর অর্থ হচ্ছে ঃ ইসলামের স্বীকৃত সদাচারণ, যা তার শিক্ষা এবং নির্দেশাবলি থেকে উৎসারিত। এটিকে এই অর্থে আলোচনা করা হবে।

উৎস

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃতিতে আচরণ নির্ধারিত হয় স্থানীয় পরিস্থিতি দ্বারা এবং এজন্য এসব অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তার সম্পর্ক থেকে যায়। W.G. Sumner এর মতে পৌনঃপুনিক প্রয়োজনে ব্যক্তির জন্য আচরণ এবং গোষ্ঠীর জন্য প্রথার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসবের ফলাফল বা পরিণতি কখনও সচেতন কিছু হিসেবে প্রতিভাত হয়না।[৩]

এই অর্থে ইসলামি আচরণ ও প্রথা 'অসচেতন' নয়। এগুলো ইসলামের দু'টো মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত। সুন্নাহ হচ্ছে ঃ রাসূলের (সা.) কথা,

---

১. F. Gabriely, *Encyclopaedia of Islam,* New, Edition London, Luzac and co; 1960, Vol. I., P. 175.

২. প্রাগুক্ত।

৩. W.G. Sumner, *Folkways.* New York: Blaisdell Publishing Co. ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃঃ-৪১।

কাজ ও পরোক্ষ অনুমোদনের সমষ্টি, কড়াকড়ি অর্থে খোদার অনুপ্রেরণায় যা অনুপ্রাণিত।

কুরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন যুগে মানব সমাজে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাপক নীতিমালা রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিনিময় ও গতানুগতিক আচরণের বিধান রয়েছে। ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক ও আইনগত আচরণের মধ্যে সীমিত নয়; এতে মানব জীবনের ও সম্পর্কের সকল শাখায় মানদণ্ড ও মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রথার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এই সার্বিক বিষয়ের অংশ হিসেবে ইসলামের ব্যাপক লক্ষ্যবস্তু থেকে ইসলামি আদব গৃহীত এবং তার ব্যাপক ধারণা ও মুল্যবোধ প্রতিফলিত।

ইসলামের 'আদব'-কে সামগ্রিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধারণা করা বা রূপায়ণ করা যাবেনা। বরং ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের সাথে তাদের আন্তঃসম্পর্কের দিকটি সব সময়েই স্মরণে রাখতে হবে। একইভাবে ইসলামি আদবের আওতায় বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলবেনা এ জন্য যে, এগুলোও ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ ব্যাপারে একটি বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। মুসলমানকে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হয়, যাতে করে সে ফজরের নামাজের জন্য শিগগিরই জাগতে পারে।

ইসলামে আদব কায়দার ব্যাপারে যে ওহির আদেশ রয়েছে– এর ধর্মীয় রূপ যথাযথ আনুগত্যের সৃষ্টি করে। এর ধর্মীয় প্রকৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসব আদব কায়দা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন বাধ্যতামূলক। ইসলামি আদবের প্রধান প্রধান নীতি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের সুনির্দিষ্ট আদব 'হারাম' থেকে হালাল নির্বাচনে কমবেশি নমনীয়তা রয়েছে। প্রথমটি আইনের দ্বারা স্বীকৃত; দ্বিতীয়টি মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের অনুমোদন ব্যতিরেকে অপরাধীদের কোনপ্রকার আনুষ্ঠানিক বিচার বা শাস্তি দেয় না। তৃতীয় পর্যায়ের আদব লেহাজ রয়েছে এমন ধরনের যা লঙ্ঘন করলেও তা গ্রাহ্য করা হয়না।

ইসলামি আদবের ওহির উৎস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, এই পদ্ধতি হবে কঠোর ও অনমনীয়। ইসলাম এমন কোন আদর্শ নয়– যা মানব-অভিজ্ঞতার

অগম্য অথবা বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রয়োগের যোগ্য নয়। বরং এই পদ্ধতির প্রকৃতি এমন যে, এটা বহু ক্ষেত্রে নমনীয়; আবার অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে সুস্থিত। ইসলাম যার ধারক; সেই মানবিক যুক্তিবিন্যাসে নমনীয়তার উপাদান নিহিত এবং এগুলোকে তার সাধারণ সূত্রের মধ্যে গণ্য করা যায়।

ইসলামের দুটি মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন বিস্তারিত বিধান ছাড়াও সাধারণ নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যাতে জীবনের বিভিন্ন দিক তথা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক– প্রভৃতি সকল বিষয়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে। এসব সাধারণ নীতিমালার কোনটাই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের আওতায় নেই। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। নিত্য নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন সমস্যার বিধিমালা প্রণয়নের জন্য ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের ব্যবস্থা রয়েছে। ইজতিহাদ হচ্ছেঃ ইসলামের মূল ভাবধারার অনুসরণে এবং তার অপরিবর্তনীয় সাধারণ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছার লক্ষ্যে ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তির সুশৃঙ্খল প্রয়োগ। সুতরাং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব, যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতদের বিশ্বাস ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা আঞ্জাম দিতে পারে। ইসলামের শিক্ষা বাস্তবিকপক্ষে মানবপ্রকৃতি ও মানবিক প্রয়োজনের সাথে সুপরিচিত। ইসলাম জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে সর্বাধিক বাস্তব উপায়ে তার মোকাবেলা করে।

অতএব, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উপযোগী করে ইসলামের সাধারণ নীতিমালাকে বাতিল অথবা সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামি আদবের বাস্তবতা ও ব্যবহারিক দিক সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সকল মুসলমানের জন্য রমজানের পুরো মাস রোজা রাখা ফরজ। তথাপি ইসলাম (মুসাফিরদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে) মুসাফিরদের রোজা রাখা মওকুফ করেছে, তবে সফর শেষ হবার পর এই রোজা পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে প্রসূতি বা যে সব মহিলার মাসিক হয়েছে এবং যারা মারাত্মকভাবে পীড়িত তাদেরকে এই রোজা পালন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। তথাপি কতিপয় হাদিস মোতাবেক মুসাফিরদেরকে কোন কোন ওয়াক্ত একত্রে মিলে পড়ার এবং চার রাকাত নামাজের 'কসর' হিসেবে দু'রাকাত পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় গ্রুপের রীতি ও পরিস্থিতি অনুসারে আদবের সংক্ষিপ্ত, চূড়ান্ত ও বিস্তারিত প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। তবে শর্ত হলোঃ পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত প্রধান নীতিমালা মেনে চলতে হবে। ইসলামি আদবের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ দৈনন্দিন জীবন সুশৃঙ্খল, ছন্দময়, মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র করা। দৈনন্দিন জীবনকে জটিল করে তোলার জন্য এগুলো কোন লোক দেখানো বা আইনানুগ প্রথা নয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ বোধগম্যতা ও নৈতিকতা

ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের প্রতিটি দিক নির্ধারণ করে দিয়েছে। অমুসলমানদের পক্ষে এই অপরিহার্য বিষয়টি অনুধাবন করা খুবই জটিল ব্যাপার। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ইসলাম তার সকল আচরণ ও ব্যবহার যাচাই করার মানদণ্ড দিয়েছে। ইসলাম অন্যান্য ব্যক্তির সাথে, সার্বিকভাবে সমাজের সাথে, প্রাকৃতিক জগতের সাথে তার সম্পর্ক এবং খোদ নিজের ব্যাপারেও তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির যথেচ্ছাচার অথবা সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বল্লাহীন দাবির বিপরীতে বহু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শুধু ইসলাম- অনুমোদিত পন্থায় খাদ্য প্রস্তুতির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা যায়, কোন মুসলমান শূকরের গোস্ত খেতে পারেনা। একজন মুসলিম মহিলার প্রকাশ্যে হাঁটুর নিম্নভাগের পা উন্মুক্ত রাখা উচিত নয়, কারণ ইসলামে তার অনুমতি নেই। মদের ন্যায় যে সব পণ্য মুসলমানদের জন্য নিষেধ; সেগুলো উপহার হিসেবেও বিনিময় করা যাবেনা। কোন মুসলমান বিবাহ উৎসবে আমন্ত্রিত হলে, তাকে সে দাওয়াত কবুল করতে হবে (অবশ্য যদি সে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে), কেননা তার জন্য এরূপ করা বাধতামূলক। মৃত্যুশয্যায় পোষিত (উল্লিখিত) ইচ্ছা ইসলামি শিক্ষার বিরোধী হলে তা পূরণ করা যাবে না। যেমন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে অতিরিক্ত সম্পদ বরাদ্দ অথবা তার দেহ পুড়িয়ে ফেলার অনুরোধ পুরণ করা যাবে না।

ইসলামের আদব হচ্ছে ঃ একটি সমন্বিত বিধান। সামাজিক আচরণের প্রতিটি দিক এর অন্তর্ভুক্ত। এটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামের অংশ। ইসলামের বিভিন্ন অংশ যেমন একটি অখণ্ড সত্তা গড়ে তোলে, তেমনি বাদবাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামি আদবের প্রয়োগ তার সর্বাত্মক রূপায়ণ ঘটাবে না;

এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। এই গ্রন্থালোচিত আচরণ ও প্রথাসমূহকে মুসলমানদের জন্য উপযোগী বিবেচনা করা হয়েছে। যাদের সত্যিকার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে অনুমোদিত শুদ্ধ আচরণের নীতি অবলম্বন করবে। ইসলামের বিভিন্ন দিক যেমন আদর্শিক, আধ্যাত্মিক, আইনগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক– প্রভৃতি পরস্পর সমন্বিত এবং একে অপরের পরিপূরক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মুসলমানদের ঈমান এবং অপরিহার্য বিষয় যে, ঈমানি চেতনায় বাইরের চাপ ছাড়াই ইসলামের নৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য বিধান মেনে চলার অনুপ্রেরণা যোগায়। একইভাবে এসব বিধিবিধান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পালনের মাধ্যমে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়; অধ্যাত্মচেতনা থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং দু'টিকে একটি শক্তিশালী স্থিতিশীল সম্পর্কের বাঁধনে সংযুক্ত করে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামের একক শক্তির বিকাশ দেখা যাবে, মহিলাদের ক্ষেত্রে আচরণের ব্যাপারে। ইসলামি সমাজে মুসলিম মহিলাদের ব্যাপারে ইসলামি ধারণার অনুসরণে এই আচরণবিধি প্রণীত।

ইসলামি আদবের ব্যাপকতার পাশাপাশি সৌজন্যের (Etiquette) সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও তুলনীয়।[৪] ইসলামের আচরণ বিভিন্ন উপলক্ষে শুধু সৌজন্যের বিধিমালা নয়, বরং সাধারণ কর্মকাণ্ড থেকে ব্যাপক সামাজিক উৎসবের সার্বিক মানবিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত। পশ্চিমা 'etiquette' এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (রাজকীয় পরিষদবর্গ ছাড়িয়ে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছলেও) উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সুরক্ষা করা।[৫] এর বিপরীতে ইসলামি আদবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ তার ধর্মীয় চরিত্র ও প্রকৃতি অনুধাবন। মানুষের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে খোদার স্মরণ থেকেই এর উৎপত্তি; এর উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ খোদার স্মরণ (যিকির) অব্যাহত রাখা এবং সঠিক পথে চলতে সহায়তা করা। ইসলামের আচরণের

---

৪. ফরাসি শব্দ Une etiuette থেকে etiquette এর উৎপত্তি। এর অর্থ হচ্ছেঃ নতুন নতুন পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য আচরণের একটি বাপক বিধিমালা, আদালতে যার মোকাবেলা করা যেতে পারে। *Academic American Encyclopedia,* Dunbury: Grolier Inc. 1942, Vol. 7, P-258.

৫. Esther & Aresty, *Encyclopedia American,* Danbury: American Corporation, 1979,Vol.10, P-635

সকল ঘটনায় খোদার রহমত তালাশ করা এটা থেকে সুস্পষ্ট হয়। ঘুম থেকে জেগে ওঠে শোওয়ার সময় পর্যন্ত মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সবক করতে হয় খোদার নাম নিয়ে। খাবার গ্রহণ, পানি পান, নতুন কাপড় চোপড় ক্রয় অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার সময় খোদার প্রতি শুকরিয়া ও তার প্রশংসা করতে হয়। এমনকি এস্তেঞ্জা করার আগেও তাকে খোদার নাম নেয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পায়খানায় প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়ার কথা বলা হয়েছে ঃ "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে শয়তান ও অশ্লীলতা থেকে আশ্রয় চাই।" পায়খানা ছেড়ে আসার সময়ও তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। সফরকালে খোদার যিকর করা এবং পূর্ণতা ও নির্দেশনার জন্য খোদার রহমত কামনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ইসলামের দু'টি বড় উৎসব হচ্ছে (দু'টি প্রধান ফরজ কাজ)– রমজান মাসে রোজা রাখা এবং মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্ব সমাপনান্তে সামাজিক উৎসব পালন।

জাতির আত্মবিশ্বাস ও শক্তির স্তম্ভ হচ্ছে নৈতিকতা, যা ইসলামি আদবের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এর পাশাপাশি কোন জাতির পতন ও ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে দুর্নীতি ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ। নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রায়ই ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে আপাতঃদৃষ্টিতে কঠোর অথবা মৌলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একজন লেখক বলেছেন, নৈতিকতার কোন কোন ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কালের বিশেষ কতিপয় জীবনব্যবস্থার চাইতে অধিকতর কঠোর ও অধিকতর বিশুদ্ধ।[৬] তবে কোন জাতির সুস্থতার ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য দুর্নীতির সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়ে মান নির্ধারক ইসলাম সঠিক দায়িত্ব পালন করেছে। ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক মানবিক পুণ্যের বিনিময়ে বস্তুগত আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করা যাবে না। তাছাড়া রাজনীতিকেও (অনৈসলামিক চিন্তাধারায় এটা অনৈতিক এমনকি নৈতিকতার সাথে সম্পর্কহীন গণ্য করা হয়) ইসলামের লক্ষ্য তথা মানবিক চরিত্র ও মানবতার বিকাশের উপযোগী হতে হবে।

---

৬. Mohommad Hamidullah, Introduction to Islam, the Holy Quran Publishing House, 1977, p-155.

মানবতার আদর্শ 'আমলে সালেহ' বা পুণ্যকর্মের উপর স্থাপিত। এই পরিভাষাটি ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যে অর্থের ধারক, তার বাইরেও তা বিস্তৃত। ইসলামি আকিদা ও আইনের অনুমোদিত মানবিক কার্যক্রমের (অপরের সঙ্গে সম্পর্কের, সজীব ও নির্জীব পরিবেশের ক্ষেত্রে) বহুদিক এর আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে মহানবীর (সা.) জীবন থেকে বহু বাস্তব উদাহরণ পাওয়া গেছে; যেমন– দু'জনের মধ্যে ন্যায়বিচার করা, কাউকে ঘোড়া চড়তে (বা গাড়িতে উঠতে) সাহায্য করা, উত্তম বাক্য বিনিময় করা, পথ কন্টকমুক্ত করা, বেওয়ারিশ কুকুর ও বিড়ালকে পানি পান করানো, অন্যকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করা ইত্যাদি। এমনকি স্ত্রীর সাথে প্রেমপূর্ণ ভাষায় কথা বলাও উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত। আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিনয়, সৌজন্য এবং সহজ সরল আচরণ। আচার ব্যবহারে কোন প্রকার গৌরব ও ঔদ্ধত্য মেনে নেয়া যায়না। কারণ তাকওয়া এবং সৎকর্ম ছাড়া কোন মানুষের ওপর অন্য মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

একইভাবে যে পোশাক পরলে অহংকার প্রদর্শিত হয়, সামাজিক মর্যাদার ভড়ং ধরা পড়ে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খাদ্য গ্রহণে নম্র ও ভদ্র পরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক। খাবার গ্রহণকালে সোফায় হেলান দেওয়া নিষিদ্ধ। খাবার গ্রহণকালে বসে খাওয়া বিনম্রতার লক্ষণ। গৃহের আসবাবপত্র সাজানোর মধ্যেও ভদ্রতা ও সংযমের বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে বিছানা পাতা যাবেনা। হাঁটার সময় প্রফুল্ল থাকা, স্বাগত সম্ভাষণ ও বক্তৃতাকালে কোন প্রকার বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ থাকা উচিত নয়।

ইসলাম বৈষয়িক ও ধর্মীয় জীবনের সকল পর্যায়ে পরিমিত ও স্বাভাবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। উগ্রপন্থা, বাড়াবাড়ি, খামখেয়ালিপনা, অস্বাভাবিক আচরণ, অস্থিরচিত্ততা এবং জটিলতাকে পরিহার করতে হবে। ইসলামি আদবে কোন কোন অনানুষ্ঠানিকতার ওপর গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম সমাজের বিরাট জনগোষ্ঠীর কাছে তার ব্যবহার সহজতর করে তোলা। আচার আচরণের স্বাভাবিকতাকে সামাজিক উত্তেজনা হ্রাস এবং সামাজিক সম্পর্ক জোরদার করার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাশ্চাত্যের আদব কায়দার উৎপত্তি ইউরোপের রাজদরবারে। রাজদরবার ও অভিজাত শ্রেণীর সাথে ব্যবহারের জন্যই এর উদ্ভাবন করা হয়েছে।[৭] সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আদবকায়দার বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়লে তার অর্থের তাৎপর্য হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে গ্রুপ থেকে গ্রুপে পাশ্চাত্যের আদবকায়দা কম-বেশি হয়। তথাকথিত 'হাই সোসাইটির' সদস্যরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্তের লোকদের তুলনায় আদবকায়দার জটিল ও অনমনীয় ধারা অনুসরণ করে। এর ফলে শ্রেণীভেদ পদ্ধতি থেকেই যাচ্ছে।

ইসলামে আদবের প্রসঙ্গটি ভিন্ন। এর উদ্দেশ্য সামাজিক শ্রেণী অনুসারে সমাজের বিভক্তি নয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মারফত জারিকৃত বিধিমালা কোন বিশেষ গ্রুপের দ্বারা প্রণীত নয় অর্থাৎ ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকদের দ্বারা অন্য গ্রুপের অধিকার 'সংরক্ষিত' বিবেচনা করার কোন কারণ নেই। এ অধিকার মুসলিম সমাজের সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইসলামে আদবকায়দার রকমারি নিয়মের কোন অস্তিত্ব নেই।

মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের ঐক্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ইসলামি আদবের ভূমিকা স্পষ্ট; কিন্তু ইসলামি আদব শুধু আচরণের সংগতি বা সামঞ্জস্য বজায় রাখা নয়; বরং তা হচ্ছে সঠিক আচরণের সংগতি বা সামঞ্জস্য বজায় রাখা। ইসলামে সদাচরণের ধারণাকে সৎ কাজের ধারণা থেকে পৃথক করা যাবে না, যেমন যাবে না ঈমান ও এবাদতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। একটি সমৃদ্ধশালী আদর্শ সমাজে ঈমান ও সৎ কাজের অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এখানে দায়িত্ব পারস্পরিক ও ভাগাভাগি করে নিতে হয়। আর পরকালে বেহেশতে দাখিল হওয়ার জন্য ঈমান ও সৎকর্ম হচ্ছে মুক্তি ও নাজাতের অপরিহায শর্ত। পবিত্র কুরআন শরীফের বহু সংখ্যক আয়াতে প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

লক্ষ্য

ইসলামে যেটা কেন্দ্রীয় ও অপরিহার্য, তা নির্ধারিত হয় ইসলামের লক্ষ্যের সাথে তার বিস্তৃত সম্পর্কের দ্বারা। এর মধ্যে রয়েছে মানব সমাজের উৎকর্ষ বা

---

৭. Amy Vanderbilt, The World Book *Encyclopaedia,* Chicago; Field Enterprises Educational Corporation, 1972. Vol. L. p-297.

সভ্যতা, সুখ ও সমৃদ্ধির বিকাশ, বস্তুগত ও নৈতিক উন্নতি ইত্যাদি। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাবে যে, ইসলামে যে হালাল ও হারামের বিধান রাখা হয়েছে তা কোন স্বেচ্ছাচারী ফরমান নয়, বরং তা হচ্ছে এক সুশৃংখল আদেশ নির্দেশের সমাহার যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ (খোদার প্রতি মানুষের বাধ্যতা ও আনুগত্য পরীক্ষা ছাড়াও) ব্যক্তিক, পারিবারিক অথবা সামাজিক পর্যায়ে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও পূর্ণাঙ্গ পন্থায় মানুষের অগ্রগতি সাধন। ইসলামি আদবের বিস্তারিত বিষয়গুলো অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা, ব্যক্তির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন কিংবা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনের প্রতি অসম্পৃক্ত নয়। বরং এসব বিষয় সমাজের সকল স্তরেও প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন মৌলিক কর্মকাণ্ডে সমাধান যুগিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবং অপরিহার্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা এবং বিভ্রান্ত মানুষকে উদ্ধার করা। এগুলো উদ্দেশ্য থেকে উপায়কে পৃথক করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদ কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে ব্যক্তি ও সমাজকে সহায়তা করে। ইসলামি আদবের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন ও কার্যক্রমের তালিকা তৈরি করে সাধারণ বিষয়টির ব্যাখ্যার সহায়ক হতে পারে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি ঃ

১. পোশাক পরিধানকারীকে প্রাথমিকভাবে আবহাওয়ার দৌরাত্ম্য থেকে তা রক্ষা করে এবং তার শরীরের গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখে।

২. গৃহায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে আবহাওয়ার দৌরাত্ম্য থেকে আশ্রয়লাভ এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রব জীবন যাপন।

৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং রোগ-বালাই থেকে মানুষকে রক্ষা করা।

৪. স্বামীর সামনে মহিলাদের আকর্ষণীয় ও প্রিয় হওয়ার মাধ্যম হল প্রসাধনী ও মেক-আপ।

৫. বক্তৃতা হচ্ছে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা বিনিময়ের অপরিহার্য কাজ সম্পন্ন করে।

৬. হাস্যরস উত্তেজনা হ্রাস করে এবং বিভিন্ন সমাবেশে জনগণের চিত্ত বিনোদনে সহায়তা করে।

৭. উপহার হচ্ছে শুভেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং এর ফলে অপরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

৮. বিভিন্ন লোককে ভোজে দাওয়াত দান, তাদের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার ফলে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হয় ও তা জোরদার করে।

৯. সামাজিক সম্পর্কেও এর বেশ মূল্য রয়েছে। কারণ এই সম্পর্কের ফলে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা রোধ হয় বা তা সীমিত করে। সামাজিক আচারের প্রয়োজন, কারণ সমাজের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাগুলো সুন্দর সমন্বয় সাধন করে থাকে।

১০. কবরস্থান মূলত ঃ মৃতদের সম্মানে নির্মিত। তবে তা জীবিতদেরকে পচনশীল মৃতদেহ থেকে রক্ষা করে।

১১. মানুষের পাশাপাশি জীবজন্তুকে প্রধানত ঃ খাদ্য, শ্রম ও পরিবহনের কাজে লাগানো হয়। তাদেরকে মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়; যেমন– বিভিন্ন পশুর মধ্যে লড়াই বাধিয়ে উপভোগ করা।

এটি সততই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের আদবের বাধাবিপত্তি ছাড়া এসব মাধ্যম পরিণতিতে পর্যবসিত হত, যা উপরোক্ত মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণাকে নস্যাত করে দিত। পোশাক, ঘরবাড়ি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উপঢৌকন ইত্যাদি ব্যক্তির বা সমাজের সম্পদের অপচয় ঘটায়; কেননা জনগণ (এসবের প্রকৃত কাজের ক্ষেত্র ভুলে গিয়ে) অন্যদের সামনে তাদের ব্যাপক ক্রয়ক্ষমতার প্রমাণ করার অর্থহীন প্রচেষ্টায় টাকা পয়সা খরচে লিপ্ত। বিশ্বে পণ্যের অপচয় করার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির এবং তাদের সমাজের সাফল্য– যে সমাজে তাদের অধিবাস। ব্যক্তির চিত্তবিনোদন বা আনন্দের প্রতি গুরুত্বদানের ফলে তা কি রকম লক্ষ্যে পরিণত হয়– পাশ্চাত্য দেশসমূহের বিরাট জনগোষ্ঠী এবং মুসলিম দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠী যে হারে সম্পদ ব্যয় করছে, তা থেকেই সেটা প্রতীয়মান হবে। কিন্তু খোদায়ী আইনে মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব তা এড়িয়ে যাবার মূল্য দিতে হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তির আত্মা (রূহ্) হারানোর মাধ্যমে; তারা আত্মা হারাচ্ছে অস্থিরচিত্তে এক পলায়নবাদ থেকে অন্য পরায়নবাদের আশ্রয় নিতে গিয়ে। তারা সর্বদাই চাচ্ছে উত্তেজনাকর সুখ অর্জন বা বিক্ষুব্ধচিত্তের অধিকারী হতে। যখনই তারা একাকীত্বের শিকার হচ্ছে, তখনই তাদের মন যাচ্ছে গভীর শূন্যতায় ভরে এবং তারা হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে।

ইসলামি আদবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রতিভার এ ধরনের অপ্রীতিকর অপচয় পরিহার করা এবং মানুষকে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দশ্য ও বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সমন্বিত করে তার সেই প্রতিভাকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করা। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি চিকিৎসার পরিভাষার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানের জীবনাচরণে থাকবে ব্যাপক প্রজ্ঞা-সেটি ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা থেকেও। এর তাৎপর্য হচ্ছে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য, ব্যক্তি এবং সমাজকে অত্যন্ত সচেতন ও বিবেচনার সাথে এসব বিধির প্রয়োগ করতে হবে। যে কোন প্রয়োগের বেলায়, সদয় ও সুবিবেচনা, এই দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ইসলামের মূল অর্থ হচ্ছে– (আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য) শান্তি; মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে খোদার ফরমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, যে খোদা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তদুপরি মহানবী (সাঃ) তাঁকেই প্রকৃত মুসলমান বলেছেন, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।

দয়া ও ভদ্রতা

রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিসে বলা হয়েছে, মুসলমানদের ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন প্রয়োজন। ইসলামি আদবের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে লোকদের প্রশিক্ষণ দান।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

১. কথা বলার সময় স্পষ্ট করে বলতে হবে, যাতে করে সংশ্লিষ্ট লোকজন শুনতে পায়, তবে উচ্চকণ্ঠে নয়।
২. খারাপ অথবা আপত্তিকর ভাষা পরিহার করতে হবে।
৩. অট্টহাসি অথবা অপ্রীতিকর শব্দ কাম্য নয়। নির্মল হাসি হাসতে হবে।
৪. কাঁদার সময় সংযম পালন করতে হবে; হৈ চৈ করে বা বুক চাপড়ে কাঁদা উচিত নয়।
৫. পানাহারের বেলায় ভদ্র পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
৬. মুসলমানকে অবশ্যই তার ক্রোধ সংবরণ করতে হবে, সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করা চলবে না।
৭. পিতামাতা তাদের সন্তানদের চমৎকার অর্থপূর্ণ নাম রাখবেন এবং জটিল ও অর্থ নেই এমন নাম রাখা থেকে বিরত থাকবেন।

৮. প্রেম, ভালবাসার ক্ষেত্রে সহৃদয়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

৯. লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে সহাস্যে সম্ভাষণ করা।

১০. অন্যের সাথে আলোচনায় প্রীতিকর চাহনি সদাচারণ হিসেবে বিবেচিত।

১১. অন্যের সমালোচনার বেলায় মুসলমানদের ভদ্র হতে হবে।

অন্যদের প্রতি বিবেচ্য বিষয়

কারো ক্ষতি করা বা তার উদ্দেশ্যে শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক অথবা নৈতিক নির্যাতন পরিত্যাগ করতে হবে। মহানবীর (সা.) ভাষায়, কারো ক্ষতি করা অথবা কারো ওপর প্রতিশোধ নেয়া উচিত নয়।[৮]

কারো সাথে ঘৃণাচ্ছলে কথা বলা সত্যিকার মুসলমানদের আচরণ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে সদাচরণ অনেকখানি নির্ভর করে অন্যের প্রতি সুবিবেচনা প্রসূত ব্যবহারের ওপর। এক্ষেত্রে ইসলামি আদবের অবদান অনেক। এ ব্যাপারে কয়েকটি উদারহণ দ্রষ্টব্য ঃ

১. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারো বিশ্বাসের নিন্দা বা গালাগাল দেওয়া নিষিদ্ধ।

২. রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যবহারের নীতি হবে থুথু না ফেলা, চেঁচামেঁচি না করা। অপরের ক্ষতি করা, বাধাদান অথবা বিরক্ত করা চলবেনা।

৩. কোন মুসলমানকে কেউ গালিগালাজ করলে এবং তার দোষত্রুটি প্রকাশ করলেও তাকে গালি দেওয়া অথবা তার ভুলত্রুটির কথা বলা ঠিক নয়।

৪. অন্যের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অভদ্র বা তির্যক কথা বলা নিষিদ্ধ। কটাক্ষ করা, চোগলখুরি করা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আন্দাজ, অনুমানের মাধ্যমে চরিত্র হনন ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫. খাবার গ্রহণকালে অপ্রীতিকর ভাবভঙ্গি দেখানো উচিত নয়, কারণ এতে অন্যেরা বিরক্ত হতে পারে।

৬. তিনজন এক সাথে থাকলে দু'জন একান্তে আলোচনা করা উচিত নয়; কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি আহত হতে পারে।

৭. মৃতদেরকে গালিগালাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এতে তাদের জীবিত আত্মীয়রা মনে আঘাত পায়।

---

৮. Al-Nawawi's *Forty Hadith* Translated by Ezzeddin Ibrahim, Damascus, Al-Duram Publishing House. 1979 P. 106.

৮. অন্যদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে তাদের আরাম, আয়েশ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার কাপড় ও মুখে দুর্গন্ধ না থাকে। পিঁয়াজ বা রসুন খাওয়ার পর কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ না করাই শ্রেয়।

৯. মসজিদে দু'জনের মধ্যে জোর করে স্থান করে নেওয়া অথবা কোথাও যাবার কালে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এর ফলে তারা বিরক্ত হবে।

১০. স্থির পানিতে, গাছের ছায়ায়, রাস্তায় বা কোন সরকারি স্থানে পেশাব, পায়খানা করা নিষেধ, কারণ এর ফলে অন্যেরা এগুলো র সাধারণ ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে অথবা এর ফলে স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

১১. পায়ের জুতো ও মোজা খুলে এমনস্থানে রাখা উচিত, যাতে তার গন্ধে অন্যকে বিব্রত না হতে হয়।

১২. হাঁচি দেবার সময় মুখ ও নাক ঢেকে রাখতে হবে। হাই তোলার সময় হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে। কথা বলার সময় বড় আওয়াজে কথা বলা উচিত নয়, হয়তো অনেকে এজন্য বিরক্ত হতে পারে। এমনকি বসার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে অন্যরা বিরক্ত না হয়। কখনও অন্যের প্রতি শরীরের পিছনের অংশ ঘুরিয়ে বসা হয়, এটাও ঠিক নয়।

সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামি আদবের ভূমিকা

ইসলামি আদবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা। আদর্শ মুসলিম ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় গুণাবলী হচ্ছে সততা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ওয়াদা রক্ষা করা, ক্রোধ সংবরণ করা, ধৈর্য, ভদ্রতা, মমত্ববোধ ইত্যাদি। এসব গুণ মানুষের মধ্যে অনাস্থার ভাব দূর করে আস্থা সৃষ্টি করে– যা সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ভিত্তি যুগিয়ে থাকে।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা উচিত অথবা নিজের জন্য যতখানি ভাবা হয় অন্যের জন্যেও তা ভাবা আবশ্যক। মুসলমানদেরকে পারস্পরিক দায়িত্বশীল হতে হবে এবং একজনকে অপরের বাস্তব সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামি আদব লেহাজে আনুষ্ঠানিকতার স্থান সামান্যই। এর ফলে অবাধ সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ প্রশাসন আরো গতিশীল হয়, বৈঠকাদি ও যাতায়াতের পথ সুগম হয়। কারণ ইসলামে বিচ্ছিন্নতা নেই। মুসলমানদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এজন্যে যে, এর ফলে সামাজিক সম্পর্ক জোরদার হয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মনস্তাত্ত্বিক কুফল থেকে ব্যক্তি রক্ষা পায়। তদুপরি মুসলমানদেরকে অবাধে দেখা সাক্ষাতের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। মেহমানদারির ব্যাপারে কর্তব্য হচ্ছে মেহমানের প্রতি অতিথিপরায়ণ ও উদার হওয়া। খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং বিয়ের ওয়ালিমায় যাওয়াকে অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রোগীদের দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া, আশ্বস্ত করা, তাদের খাদ্য সরবরাহ করা, সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে উপহার বিনিময় করা, সাক্ষাতে বা বিদায় নেবার সময় মোসাফাহা করা, বিয়ে বা জন্মের ন্যায় খুশির দিনে শরীক হওয়া– এগুলো সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে এ ধরনের বিনিময়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুসলমানদের বলা হয়েছে, সময়ে সময়ে ভোজের আয়োজন করতে এবং এ উপলক্ষে লোকদের দাওয়াত দিতে। বিয়ে, জন্ম এবং কুরবানীর দিনের ন্যায় দিনগুলোতে ভোজনের আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য সত্ত্বেও একত্রে ভোজনের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ে। এজন্য যেসব ভোজের মজলিশে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরিবদের বাদ রাখা হয়– এ ধরনের ভোজকে ইসলাম নিকৃষ্টতম ভোজ হিসেবে গণ্য করে। ব্যক্তিগত স্বার্থমুক্ত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এ হবে মূলতঃ খোদার সন্তুষ্টির জন্য। অনুরূপভাবে, প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কারো দেওয়া উপহার মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অথবা কোন কিছুর প্রত্যাশার বিনিময়ে দাওয়াত দেওয়া হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে ব্যাপক মেলামেশার জন্য সামাজিক জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের

সাথে আদায় করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমাজের বহু মানুষ এবং নানা বর্ণের মানুষ দিনে একাধিকবার মেলামেশার সুযোগ পায়। শুক্রবার জু'মার নামাজ আদায় করার জন্য মুসলমানরা মসজিদে সমবেত হয় এবং দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমানদের ওপর এটা ফরজ। এছাড়া বছরে দু'টি আরো উৎসব রয়েছেঃ একটি হচ্ছে ঈদুল ফিতর এবং অপরটি ঈদুল আযহা। তাছাড়া বিশ্বের সকল স্থান থেকে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কা শরীফে পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য সমবেত হয়।

মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মুসলমানরা মসজিদে সমাজ ও দেশের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। মসজিদ জনগণের মিলন কেন্দ্র হিসেবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং এরকম রাখা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। মসজিদের পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার উপর সেখানকার সামাজিক বৈঠকের সাফল্য নির্ভর করে।

অপরের সঙ্গে আলোচনা করার সময় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের প্রত্যহ গোসল করতে হয়। তাছাড়া যখনি সম্ভব, প্রকাশ্য সমাবেশে (যে কোন শুক্রবার জুমার জামায়াত, দু'টি ঈদ উৎসব) যোগ দেওয়ার আগে পরিচ্ছন্ন কাপড়, আতর ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। বিশেষ করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেগুলোর ব্যবহার সর্বাধিক যেমন হাত ও মুখমণ্ডল সর্বোপরি মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখতে হয়। কারণ মত বিনিময় ও অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা এ সময়ে নজরে পড়ে।

ইসলামি আদবের ধর্মীয় দিক

ইসলাম খোদার বিশুদ্ধ এককত্ববাদ বা তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম অথবা পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভাবিত সব রকম বহুত্ববাদ ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। শরীয়াহ হচ্ছে এই ধারণাগুলোরই বহিঃপ্রকাশ এবং খুঁটিনাটি সবকিছু শরীয়াহ থেকে উদ্ভূত। ইসলামি আদব তৌহিদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তার মৌল নীতির প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন জানায়।

কয়েকটি উদাহরণ

১. খোদা ব্যতীত অপর কারো দাস বুঝায় যেমন আব্‌দ আল নবী (নবীর দাস) এমন নামকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২. খোদার কর্তৃত্বাধীন যেমন বায়ু বৃষ্টি, প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিদর্শনকে অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ। একইভাবে কারো ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের জন্য খোদাকে দোষারোপ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩. বক্তব্য বা বিস্ময়সূচক উক্তি যা তৌহিদের বিরোধী যা খোদার শরীকানা স্বীকার করে বলে ধারণা করা হয়, তা নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খোদা যা ইচ্ছা করেন অথবা খোদা ও তুমি ছাড়া আমার কোন সাহায্যকারী নেই– এ ধরনের বক্তব্যদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৪. কুরবাণী শুধু আল্লাহর জন্যই করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে তার নাম নেয়া না হলে অথবা অন্য কারো নামে জবাই করা হলে ঐ প্রাণীর গোশত হারাম হবে এবং কুরবানী বাতিল হবে।

৫. কারো মৃত্যু হলে ইসলাম বিরোধী বক্তব্যদান যেমন, আমাদের এখন কি হবে অথবা লোকটি অকালে মৃত্যুবরণ করেছে ইত্যাদি বলা নিষেধ।

৬. খোদার নাম বা ছিফাত ছাড়া অন্য কারো নামে বা বস্তুর শপথ করা নিষিদ্ধ।

৭. আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে মানত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা পূরণ করা যাবেনা।

৮. আল্লাহ্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা করা নিষিদ্ধ বরং বলতে হবে ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেন ত)।

৯. কোন মানুষকে সেজদা করা যাবেনা। কারণ সেজদা শুধু নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্কেই করতে হবে।

১০. কোন কিছুর অশুভ আশঙ্কা করে সফর থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়, কারণ তা তকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী।

১১. ইসলামের নির্দেশিত করবস্থান জিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃতদের কথা স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি জীবিতদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং অন্যদের প্রতি সদাচারের মাত্রার উন্নতি সাধন করা।

১২. কাবা শরীফ পৃথিবীতে খোদার পয়লা মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তৎপুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) মক্কায় উহা নির্মাণ করেন। সারা বিশ্বের মুসলমানরা নামাজে কিবলামুখী হয়। এটা মুসলিম ঐক্য ও ইসলামি ঐক্যের প্রতীক। কিন্তু মুসলমানদের নামাজের চেয়ে এর পারিপার্শ্বিক

অবস্থানের গুরুত্ব অনেক বেশি। জীবজন্তু জবাই করার সময় পশ্চিমমুখী হয়ে জবাই করা হয়। মুসলমানদের লাশ কবরে শায়িত করা হয় কিবলামুখী করে। এমনকি পায়খানা বা টয়লেটের ডিজাইন কিবলার সাথে সম্পর্কিত। এস্তেঞ্জার সময় মুসলমানদের কিবলামুখী না হওয়া বা কিবলাকে পিছনে ফেলে না বসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম ঐক্য ও সংহতিতে ইসলামি আদব কায়দার অবদান সম্পর্কে এই গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। মান নির্ধারক ইসলামের আদব লেহাজ নিষ্ঠার সাথে মেনে চললে বহু বিদ্য়াত দূর করা সম্ভব। মূল ও প্রকৃত ধর্মীয় ইসলামি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন কোন আকিদা বা আচরণ যুক্ত করাকে বিদ্য়াত বলে।

নবী করিম (সা.) বিদ্য়াত প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "যে কেউ আমাদের ধর্মের মধ্যে নতুন কোন কিছু সংযোজন করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।[৯] এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন থেকে সাবধান থেকো; কারণ প্রতিটি বিদ্য়াত হচ্ছে পাপ এবং প্রত্যেক পাপ দোযখের দিকে টানবে।"

ইসলামের সঙ্গে কোন কিছুর সংযোজন করাকেই বিদ্য়াত বলে এবং তা বাতিল। ইসলামি জিন্দেগির বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্য়াতের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নেতিবাচক। এর পরিণামে ইসলামের সহজ সরল বিধান জটিল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়, যদ্দরুণ মুসলিম জিন্দেগির দু'একটি বিশেষ দিক ছেড়ে দিতে হয় বা বাতিল করতে হয়। বিদ্য়াতকে ইজতিহাতের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে মিল করা ঠিক নয়। কারণ ইজতিহাদ হচ্ছে ইসলামের বিধি বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির ব্যবহার। যোগ্যতাসম্পন্ন ওলামায়ে কেরাম-ই এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে, মুসলমানদের আচার ব্যবহারে বহু অনৈসলামিক বিষয় যুক্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো ঃ

১. ইসলামে কতিপয় ধর্মীয় উৎসব চালু করা হয়েছে; যেমন মহানবীর (সা.) জন্মদিন (মিলাদ), তাঁর ঊর্ধ্বাকাশে আরোহন (মিরাজ) এবং তাঁর দেশত্যাগ (হিজরত)।

---

৯. Al-Nawaw's *Forty Hadith.* p-40

২. কবরস্থানের দিকে লাশ নিয়ে যাবার সময় উচ্চঃস্বরে যিকির করা এবং জোরে কুরআন তেলওয়াত করা।

৩. প্রত্যেক জামাতে নামাজ আদায়ের পর মোসাফাহা করা।

৪. কারো মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে খাবার তৈরি করে তা অন্যকে খাওয়ানো। অথচ প্রকৃত ইসলামি আকিদা হলো, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে খাবার তৈরি করে শোকাহত পরিবারকে খাওয়ানো; কারণ এ সময় তারা শোকে মুহ্যমান থাকে।

৫. খবর বাঁধানো ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করণ।

ইসলামি আদবের মনস্তাত্ত্বিক দিক

ইসলামি আদবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

১. মহিলাদের মাসিকের সময় তালাক দান করাকে নিরুৎসহিত করা হয়েছে, কারণ এ সময় মহিলারা মনস্তাত্ত্বিক চাপে দিন কাটায়।

২. স্বাস্থ্যগত সুবিধা ছাড়াও ইসলামে পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতার ফলে শরীর ও মন সতেজ থাকে। নামাজের আগে অজু করা, যৌনসঙ্গমের পর গোসল করা, সন্তান প্রসব ও মাসিকের পর গোসল করার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যারা লাশের গোসল করান তাদেরকেও গোসল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পরামর্শের তাৎপর্য হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে গোসল করার ফলে জনগণ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে।

ইসলামি আদবের মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্যগত দিক

ইসলাম মুসলমানদের সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকার শিক্ষা দিয়ে থাকে। বিশ্বস্ত মেডিক্যাল সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, শরীর, স্থান ও পোশাক পরিচ্ছদের প্রাত্যহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা শরীরের সুস্থতা রক্ষায় ব্যাপক অবদান রাখে। পরিচ্ছন্ন থাকার ফলে রোগ- জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মুসলমানদের নামাজের পূর্বে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে প্রত্যহ কয়েকবার অজু করতে হয়। শরীরের যে অংশ ধূলাবালির উন্মুক্ত থাকে জন্য তা-ই প্রধানত ধৌত করতে হয়।

ইসলাম নখ কাটার বিধান এজন্য করেছে যে, হাতের যে অংশের সাহায্যে প্রতিনিয়ত খাবার খাওয়া হয় ও পানি পান করা হয়– এবং করমর্দন করতে হয়– সেগুলোকে ময়লা ও অশুচি থেকে রক্ষা করার জন্যে। বগলের চুল ও গোপনাঙ্গের চুল কাটার বিধান করেছে ইসলাম। এটি সোয়েট গ্লাণ্ডস (Sweat Glands) কে কাজ করতে সহায়তা করে এবং সুইট গ্লাণ্ডসের ক্ষতি করতে পারে, এমন সব জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে তা বাধা দেয়। মুসলমানকে তার কাপড় চোপড় ও নিজেকে মল ও পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। পেশাবে ইউরিয়া এবং অন্যান্য নাইট্রোজেনের যৌগ বিদ্যমান। এগুলো জীবাণুর তৎপরতায় এ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। মলমূত্র থেকে সংক্রমণের মাধ্যমে Pinworm (oxy uriasis), Viral hepatitis, Scabies এবং Taniasisi – প্রভৃতি রোগ বিস্তার লাভ করে।

মুসলমানদের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয় বরং উদরপূর্তির আগেই আহার বন্ধ করা উচিত– এ ধারণা চিকিৎসাগত, সামাজিক ও নৈতিক কল্যাণ থেকে উৎসারিত। পাকস্থলীতে রয়েছে সম্প্রসারণশীল receptors,এটি স্ফীত হলে ব্যথা ও অস্বস্তি ও অন্যান্য রোগের সৃষ্টি হতে পারে। পানি পানকালে মুসলমানদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পাত্রে (বা গ্লাসে) নিঃশ্বাস না ফেলতে; কারণ আভ্যন্তরীণ বাতাসের চাইতে পানিতে বিদ্যমান বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অনেক কম এবং দেহের সঞ্চালন তন্ত্রগুলোতে অধিকহারে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি শরীরে নেতিকবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মুসলমানরা দুধ পানের ফলে যে কল্যাণকর সুবিধা পেয়ে থাকে, তার জন্যে খোদার শুকরিয়া প্রকাশ করে থাকে।[১০] দুধ আদর্শ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এতে প্রধানতঃ ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম, ফসফেটসহ অনেক ভিটামিন ও খনিজ ছাড়াও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ও প্রোটিন বিদ্যমান। এগুলোর অভাবে শিশুদের শরীর গঠনে অসুবিধা ও বড়দের রক্তশূন্যতা (Oesteomalacis) দেখা যায়।

ইসলামের বিধান অনুসারে পশু জবাই করার ফলে রক্তমুক্ত গোশত পাওয়া যায়। রক্তে বহু সূক্ষ্ম জীবাণু বাস করে, যা বহু রোগের উৎস হতে পারে। স্বাস্থ্যগত

১০. মিশকাত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫।

দিক ছাড়াও বহু লোক রক্ত মিশ্রিত গোশত দেখে অথবা গোশতের মধ্যে রক্ত নিঃসৃত হতে দেখে বিরক্ত বা পীড়িত হয়ে পড়ে।

ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। শূকর আবর্জনা ও উচ্ছিষ্টসহ যে কোনো খাদ্য খেয়ে থাকে। এ ব্যাপারে স্যাকর (Sakr) বলেন, শূকরের দেহে বহু সংখ্যক জীবাণু, পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়া থাকে এবং এই মাংস খাওয়ার পর এসব রোগ মানবদেহে সংক্রমিত হয়। এসব জীবাণুর মধ্যে রয়েছেঃ ফিতা ক্রিমি, বক্র ক্রিমি, Hookworm, Faciolopsis, Paragonimus, Clonorchis Senesis ও Erysipelothrix Rhusphathiae.[১১] তিনি আরো বলেন, সর্বাধিক জীবাণুবাহক শূকর হচ্ছে বহু মারাত্মক ও জটিল রোগের উৎস। এর মধ্যে রয়েছে আমাশয়, Trichinosos, ফিতা ক্রিমি, বক্র ক্রিমি, হুকওয়ার্ম, জন্ডিস, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, আন্ত্রিক প্রতিবন্ধক (Intestinal Obstruction), মারাত্মক প্যানক্রিয়াটিটিস (Acute Pancreatitis), যকৃতের প্রসারণ (Enlargement), ডায়রিয়া, শারীরিক দুর্বলতা, মারাত্মক জ্বর– যদ্দরুণ শিশুদের বিকাশ ব্যাহত হয়, টাইফয়েড, অঙ্গহানি, হৃদরোগ, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্ব এবং আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি।[১২]

ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ। এর কিছুটা উপকারী দিক থাকলেও এর ফলে যে মাদকাসক্তির সৃষ্টি হয়, তাতে নৈতিক ও শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তদুপরি অধিক মদ্যপানের ফলে পাকস্থলীতে জ্বালা এবং পেপটিক আলসার হয়। এর ফলে যকৃতের প্রদাহ, লিভার সিরোসিস এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে যকৃত বিকল হয়ে যায়।

মুসলমানদের হাঁচি আটকে রাখা ঠিক নয়, বরং এ জন্য খোদার শোকর করা উচিত। উপরের শ্বাস-প্রশ্বাসের অঞ্চল থেকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির জ্বালা হতে এর উৎপত্তি এবং এর ফলে জ্বালাতনকারী পদার্থ বের হয়ে যায়। হাঁচি ঠেকিয়ে রাখলে জ্বালাতনকারী পদার্থ রয়ে যায় এবং প্রদাহের সৃষ্টি করে। হাঁচির সময় মুখ

---

১১. A. H. Sakr *Possible Reasons for its Prohibition,* Published by the Author, 1975, P-15.

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮।

ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে কোন ব্যক্তির উপরের শ্বাস প্রশ্বাস অঞ্চলে বিদ্যমান জীবাণুর সঞ্চালন রোধ করা যায়।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খতনা করা ফরজ এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের কোন কোন দেশে মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডেই বর্ধিত হারে খতনা করা হচ্ছে। লিঙ্গের অগ্রত্বক কেটে না ফেলা হলে ময়লা ও জীবাণু জমতে পারে, ফলে ব্যাক্টিরিয়ার বিকাশ হতে পারে। একারণে নারীদের যৌনাঙ্গে ক্যান্সার সদৃশ পরিবর্তন হতে পারে।

মহিলাদের মাসিকের সময় যৌনসঙ্গম ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে দুটো কারণে ঃ

১. মাসিকের সময় গর্ভাশয়ের সংকীর্ণ অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়; ফলে সঙ্গমের দরুণ জরায়ু ও ডিম্বনালীতে ব্যাক্টেরিয়া প্রবেশের পথ সুগম হয়। পরিণামে প্রদাহ ও আঠালো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। ফলে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হতে পারে।
২. পুরুষ তার যৌনাঙ্গে রক্ত দেখার পর তারও শরীরে নেতিবাচক দৈহিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর ফলে তার স্ত্রীর সঙ্গে যথানিয়মে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তার মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হতে পারে।

পায়ুপথে সঙ্গমের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে ঃ এটা এক যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া এবং এর ফলে মলত্যাগে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পুরুষের যৌনাঙ্গ মলসিক্ত হতে পারে, আর এই মলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থাকতে পারে, যার ফলে পুরুষের যৌনাঙ্গ সংক্রমিত হতে পারে।

মাসিকের সময় মহিলাদের যৌন হরমোনসমূহ বিঘ্নিত হয়– পরিণামে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় দেখা যায় এবং তা প্রতিভাত হয় স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও দৌর্বল্যে। মাসিকের সময় মহিলাদের আচরণে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণ এখানেই নিহিত। এজন্য এসময় মেয়েদের নামাজ ও রোজা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ইসলামি বিধান মোতাবেক মৃতদেহকে শিগগিরই কবর দিতে হয়। এর ফলে যে পচনের ক্ষতির ব্যাপারে মুসলমানরা সজাগ, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় এই বিপদের আশঙ্কা আরো বেশি। কারণ সেখানে লাশ শীতল রাখার সুযোগ সুবিধা নেই।

প্রহরী ও শিকারী কুকুর ছাড়া কুকুর প্রতিপালনের অধিকার মুসলমানদের দেওয়া হয়নি। তবে এসব কুকুরকেও বাড়ির বাইরে রাখতে হবে। কুকুরের মুখের লালায় জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু রয়েছে, যা কুকুরের কামড় অথবা চামড়ায় কোন ঘায়ের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। কুকুরের অন্ত্রে এক প্রকার কৃমি (Echinococcus) থাকে, যা কুকুরের মল দ্বারা দূষিত খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। এর ফলে যকৃত এবং ফুসফুসে প্রাথমিকভাবে মলকোষ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ইসলামি আদবের ভূমিকা

সুস্থ অর্থনীতির বিকাশে ইসলামি আদব মেনে চলা অপরিহার্য। বাহুল্য ব্যয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ, মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; এমনকি সেটিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শান্তি ও যুদ্ধ– এই উভয়কালেই অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যের ধারক হিসেবে অর্থ-তাৎক্ষণিক ক্রয়ক্ষমতা এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।[১৩] সার্বিকভাবে জাতির অর্থনৈতিক শক্তি থাকা অপরিহার্য। কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছেমত যাচ্ছে তাই ভাবে যেকোন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার অধিকারী নয়। কেননা এর ফলে জাতীয় শক্তির ধ্বংস নেমে আসে। ইসলামি আদব মিতব্যয়িতার জন্য মুসলমানদেরকে ধর্মীয়ভাবে উদ্দীপ্ত করে। অন্য কথায় বলা যায়, অমিতব্যয়িতা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে আল্লাহর কাছে চির অকৃতজ্ঞ।"[১৪]

এখানে ইসলামি জীবনধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো। এতে সুস্থ অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে ইসলাম কতখানি গুরুত্ব দেয়, তা অনুধাবন করা যাবে।

১. পানাহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে। সামান্য পরিমাণ খাদ্যও অপচয় করা যাবে না। অপচয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞার ফলে বিপুল পরিমাণ জাতীয় সম্পদ সাশ্রয় হবে এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের দিকে তা পরিচালনা করা যায়।

---

১৩. *Encyclopaedia Britannica,* London : William Bentow : Vol. 15. 1971, P-701.

১৪. *The Holy Quran,* M. M. Pickthall অনূদিত [NewYork : Muslim World League], সূরাহ মায়িদা ঃ আয়াত ৩।

২. পোশাক পরিচ্ছদেও মিতাচার প্রয়োজন। পোশাকই যেন উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। পোশাকের ব্যাপারে বিপুল অর্থ ব্যয় করা চলবে না।

৩. আসবাবপত্র ও অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রী মধ্যম মানের মূল্যে কেনা উচিত। বাড়ির আসবাবপত্র, তৈজসপত্র বা অন্য কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে স্বর্ণের বা রৌপ্যের ব্যবহার চলবে না। তাছাড়া রেশম বা রেশমি কারুকার্য খচিত পোশাক বা আসবাবপত্র ব্যবহার করা যাবে না।

৪. জমকালো ভবন নির্মাণে অর্থের ব্যয় করা চলবেনা। এমনকি মসজিদ নির্মাণেও অমিতব্যয়ী হওয়া চলবেনা। উভয় ক্ষেত্রে অলংকরণও পরিহার করতে হবে।

৫. ইসলামি বিধানে আদর্শ বিয়ে হয় সবচেয়ে কম খরচে এবং এক্ষেত্রে বাহুল্য ব্যয় হয় না।

৬. দাফন কাজে মিতব্যয়ী হতে হবে। এক্ষেত্রেও অমিতব্যয়িতা নিষিদ্ধ। বিশেষ বাধ্যবাধকতা বা স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া কফিন বাক্স ব্যবহার করা চলবেনা।

৭. ইসলামে অতিথি আপ্যায়ণের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও বাহুল্য ব্যয় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৮. শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের জন্য একঘন্টা ছাড়া শুক্রবারে কাজ বন্ধ করার কথা ইসলামে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। প্রয়োজনীয় কাজ অব্যাহত রাখতে হবে; কেননা এক দিনের জন্যও কাজ বন্ধ রাখা হলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে। শুক্রবার কাজ পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়নি; ইসলামে সাবাথ-এর ধারণা অনুপস্থিত। তবে মুসলমানদের কোন ছুটির দিন হলে তা শনিবার বা রোববার হওয়া উচিত, নয় শুক্রবার হতে হবে।

৯. মুসলমানের ওপর অর্পিত কোন কাজের দক্ষতা ও সম্পূর্ণতা দান তার কর্তব্য বলে ইসলাম বিবেচনা করে। হাদিসে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা রেখেছেন।[১৫] কর্মোদ্যোগ ও গুণগত মানের সমন্বয়ে একটি সফল অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব।

---

১৫. আল নববীর ৪০ হাদিস, ৬৪ পৃঃ

বিয়ে, পরিবার ও ইসলামি আদব

পরিবার এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যা থেকে নতুন বংশধরদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকশিত এবং বিস্তৃত হয়। পারিবারিক ইউনিট ছাড়া এসব মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অস্তিত্ব থাকেনা। পারিবারিক ব্যবস্থা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক একটি সমাজের সার্বিক চরিত্র এবং তা সভ্য না অনগ্রসর– সেটা নির্ধারণ করে।[১৬]

বিয়ে এবং পরিবারের গুরুত্ব এত বেশি বলে, কুরআনের বহু আয়াতে এবং বিভিন্ন হাদিসে এ দুটো বিষয়ের ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যে সফল বিয়ে এবং নৈতিকভাবে দৃঢ় ও স্থিতিশীল একটি সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় ভিত্তিও বিস্তারিতভাবে পেশ করা হয়েছে।

১. মুসলমানদের যুবক বয়সে বিয়ে করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বিয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন আত্মীয় সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মীয় পরিজনের পরিধি বাড়ানো হয়। শিশুকে দুধমাতার মাধ্যমে স্তন্যদানেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ এর ফলে নতুন আত্মীয়ের মাধ্যমেও পরিবারের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এদের বলা হয় 'দুধমাতার আত্মীয়।'

২. সহজসাধ্য কর্তব্য হিসেবে মুসলমানদের বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলামি বিধান মতে সবচেয়ে আদর্শ বিবাহে বর-কনের ওপর বোঝা কম পড়ে।

৩. ইসলামে বিবাহ উৎসব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কারণ বিয়ে একটি সামাজিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৪. সাধারণভাবে ইসলামে গান গাওয়া নিষেধ হলেও বিয়ের সময় তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিয়েতে ভোজের মজলিশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ উপলক্ষে দাওয়াত গ্রহণ সম্ভব হলে, তা প্রত্যাখ্যান না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

১৬. Sayyid Qutb. *Milestones,* I. I. F. So. 1977 pp. 183-4.

ইসলামে বিবাহ বন্ধন সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মজবুত বন্ধনের ওপর স্থাপিত না হলে বিয়ে সফল হয়না। বিয়ের সাফল্যের জন্য নিম্নোক্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ঃ

১. বিয়ে করার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের পূর্ণ পারস্পরিক সম্মতি।

২. নারী ও পুরুষের একই ধরনের সামাজিক পটভূমি ও সমতা প্রয়োজন। জীবন সম্পর্কে, জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা এবং মতপার্থক্য উত্তরণের ব্যাপারে একই ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ প্রয়োজন। ইসলামি আকিদা ও শরিয়তে এগুলোর বিধান রাখা হয়েছে। সুতরাং আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হচ্ছে তারা যারা ইসলামের প্রতি সর্বাধিক অনুগত।

৩. বিয়ের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইসলামের পরামর্শ, ইসলাম সম্পর্কে একে অপরের জ্ঞান ও আমলের ব্যাপারে নারী পুরুষকে পর্যাপ্ত জানতে হবে। তাছাড়া একে অপরকে দেখেও নিতে হবে।

৪. ইসলামে অস্থায়ী বা মুতা বিয়ের ধারনার কোন স্থান নেই। ইসলামে শুধু স্থায়ী বিয়ের ধারনাই স্বীকৃত।

৫. বিয়েতে সকল শর্ত পূরণের জন্য চুক্তি সম্পাদনকে ইসলাম সর্বোত্তম কাজ এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ বিকাশ হিসেবে উল্লেখ করেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের যেসব উল্লেখযোগ্য শর্ত পূরণ করতে হয়, সেগুলো বিয়ের চুক্তির (কাবিননামা) অন্তর্ভুক্ত।[১৭]

৬. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে তা কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৭. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সফল করে তুলতে হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমঝোতা, সহযোগিতা, প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামি আদবের পর্যালোচনা করলে ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। নিম্নোক্ত পন্থায় ইসলামি আদবে স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ঃ

---

১৭. *মিশকাত*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭১।

১. পরস্পরের বিয়ে না হলে পুরুষকে মৃত নারীর লাশ ধৌত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মৃত পুরুষের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। মৃত স্ত্রীকে স্বামী কবরে স্থাপন করার অধিকার রাখেন।

২. স্বামী-স্ত্রী ছাড়া রক্তের সম্পর্ক ভাই বোন অথবা পিতামাতা, পুত্র-কন্যা হলেও নারী ও পুরুষকে একে অন্যের গোপনাঙ্গ দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

৩. মহিলাদের ভাই বা পিতাসহ কোন আত্মীয়ের জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ নিষিদ্ধ। তবে কোন বিধবা তার মৃত স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারে।

ইসলামি আদবে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই বেহেশত মাতার পদতলে।" অপরের প্রতি সদাচারণ যদি শিষ্টাচারের প্রতীক হয়, তাহলে পিতামাতার ক্ষেত্রে তা করা ফরজ। সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত 'পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়ের কর্তব্য' শিরোনামে ছেলেমেয়েদের প্রতি বিরাট দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু পিতামাতা ও ছেলেমেয়ের মধ্যেই মজবুত আত্মীয়তা, স্নেহ-ভালবাসা ও দায়িত্ব সীমিত থাকা উচিত নয়, তা সকল আত্মীয়ের বেলায় ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতে হবে; যাতে করে তাদের অবহেলা করা হচ্ছে বলে তারা অনুভব করতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ আর্থিকভাবে যারা অধিকতর স্বচ্ছল, তাদের উচিত দুঃস্থ আত্মীয়দের সাহায্য করা। কোন মুসলমান ঋণী অবস্থায় মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনদের যত তাড়াতাড়ি হোক সে ঋণ পরিশোধ করা উচিত।

মা ছাড়া দাই এর সাহায্যে শিশুর দুধ পানের ব্যবস্থা করা হলে, আত্মীয়তার পরিধি বেড়ে যায়। এটাকে পারস্পরিক দায়িত্ব হিসেবে স্বাগত ও স্বীকৃতি জানানো উচিত।

ইসলামি আদবে পারিবারিক চেতনা ও দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; কারণ পরিবার হচ্ছে সার্বিক মানবিক অনুভূতির প্রাথমিক ভিত। সুতরাং সুস্থ ও সুস্থিত সমাজের উত্তম ভিত হচ্ছে সুস্থ ও স্থিতিশীল পারিবারিক জীবন।

ইসলামে যৌনাচরণ বিধি

আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির অংশ হিসেবে ইসলাম যৌনতার স্বীকৃতি দেয়। তার সৃষ্ট সব কিছুই তার বিধান মোতাবেক আচরণ করলে খারাপ বা ভুল হতে পারে না।

সন্দেহ নেই, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সার্বিকভাবে সমাজের এক অপরিহার্য বিষয় যৌনজীবন। ব্যক্তিগত স্বার্থ-চেতনা এবং ভালবাসার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে যৌনতার বিকাশ নিবিড়ভাবে গড়ে উঠে। যৌনজীবনে বঞ্চনার ফলে অপরিচ্ছন্ন থাকলে মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়, সুসম্পর্ক ব্যাহত হয় এবং সমাজে দক্ষতার অভাব ঘটে। বিবাহের মাধ্যমে যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না করলে যৌনপ্রবৃত্তি ধ্বংসাত্মক হতে পারে। এটা তখন ব্যক্তি, বিয়ে ও পারিবারিক প্রথা এবং সার্বিকভাবে সমাজের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করবে। মূলতঃ যৌনতা ব্যক্তিকে তার বেপরোয়া পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে; অপরদিকে এর বেপরোয়া গতি সমাজ জীবন যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল তা বিপন্ন করতে পারে।[১৮]

সুতরাং যৌনাচারকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা অবশ্য কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়; সমাজে যে সব উপায়-উপকরণের সাহায্যে ব্যক্তির যৌন আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা অসম্ভব মনে হতে পারে। নিম্নোক্ত আচরণবিধি অনুসরণের মাধ্যমে ইসলাম এই সমস্যার সমাধান পেশ করেছে ঃ

১. সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিবাহকে সহজ করতে হবে এবং বিবাহের সময় হওয়ার সাথে সাথেই বিয়ে করার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. বিবাহ-বহির্ভূত যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ব্যাপারে যে সকল কারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে তা বন্ধ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ইসলামি আদব গুরুত্বপূর্ণ ঃ

ক) মহিলাদের শরীর এমন যে, তা দৃষ্টে পুরুষদের মধ্যে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এজন্য ইসলাম সবরকম নগ্নতা এবং নারীর সম্ভ্রমহানির সব রকম পথ নিষিদ্ধ করেছে। পুরুষদের দৃষ্টি থেকে নারীদের রক্ষা এবং তাদের সৌন্দর্যকে পুরুষদের সামনে প্রকাশ না করার জন্য মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া

---

১৮. G. P. Murdock. *Social Structure* (NewYork : Macmillan & Co. 1949), P. 260.

সমগ্র দেহ ঢেকে রাখার লক্ষ্যে ইসলাম এক ধরনের পোশাক নির্ধারণ করে দিয়েছে। সন্দেহ নেই, পোশাক আন্তঃব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়ে দেয়, এর মধ্যে যৌন আকর্ষণ অন্যতম।

খ) নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন করে দিতে চায়, যেন যৌন উত্তেজনা হ্রাস পায়।

গ) মুসলিম মহিলাদের গৃহের বাইরে প্রসাধনী সামগ্রী দিয়ে মুখমণ্ডল সুশোভিত করা অথবা সুগন্ধী ব্যবহার করে ভিন্ন পুরুষের সংযম বিপন্ন করা উচিত নয়। এ ধরনের প্রসাধনীর ব্যবহার বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তা স্বামীর সামনেই করা যাবে।

ঘ) পুরুষদের ব্যবহৃত প্রকাশ্য গোসলখানায় মহিলাদের গোসল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

ঙ) স্বামী অথবা মহরম পুরুষ (যার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) ছাড়া অন্য কোন লোকের সাথে কোন নারী কথা বলার সময় বলার ভঙ্গি আকর্ষণীয় হবেনা বরং তা বস্তুনিষ্ঠ ও সংক্ষিপ্ত হবে।

চ) পুরুষদের পোশাক ও ব্যক্তিগত আচরণ শোভন হওয়া প্রয়োজন। তবে কোন মুসলমান যদি কোন মহিলার প্রতি তাকিয়ে ফেলে, তাহলে সে তার চক্ষু ফিরিয়ে নেবে, দ্বিতীয়বার তাকানো নিষিদ্ধ।

ছ) ইসলামি আদবে যৌন সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী উভয়কে একে অপরের রহমতস্বরূপ ও পরস্পরের ভূষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের যৌন জীবন নিয়ে অন্যদের তামাশা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যৌন আচরণ সম্পর্কিত উল্লিখিত বিধিসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ বিবাহের আওতায় নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক থেকে সুবিধা লাভ এবং বিবাহের উপযোগিতা থেকে সমাজের ফায়দা লাভ ও পারিবারিক সম্পর্ক নিশ্চিত করা।

ইসলামি আদব এবং নারীর মর্যাদা

ইউরোপ যখন তমসাচ্ছন্ন যুগে নিমজ্জিত ছিল, তখন নারীর আত্মার প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক হোত তাদের আত্মা মানবিক কি-না। ইসলাম তার পূর্বেই নারী ও

পুরুষকে একই উৎস থেকে আসার কথা জানিয়েছে এবং খোদা ও সমাজের কাছে তারা উভয়ে সমানাধিকারসম্পন্ন এবং ভাল ও মন্দ কাজের জন্য পুরষ্কার ও শাস্তির ঘোষণা শুনেছে। ইসলামি আইন নারী ও পুরুষের জন্য সমান। ইসলামে নারীর অধিকার রয়েছে সম্পত্তি সংরক্ষণের এবং তা আবাদ করার। তার নিজ স্বার্থে তার সম্পত্তির ইজারা দান, হেবা করে দেওয়া অথবা আবাদ করার অধিকার রয়েছে।[১৯] যদিও নারীর প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে মাতৃত্ব, মানব বংশের লালন-পালন এবং নিজ বাড়ির হেফাজত, তথাপি ক্রয়-বিক্রয়, ধার দেওয়া ও নেওয়া, বিনিয়োগ করা– ইত্যাদি আর্থিক লেনদেন করা থেকে তাকে বিরত রাখা হয়নি। ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবে নারীদেরকে এ ধরনের কর্ম সম্পাদনে পুরোপুরি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আইনানুগভাবে উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে।

মদ্যপান, ব্যভিচারি, খোদাদ্রোহীতা অথবা হত্যার মত যে কোনো অপরাধের জন্য ইসলামি আইনে শাস্তির ব্যাপারে নারী ও পুরুষের কোন পার্থক্য করা হয়নি।

ইসলামে মহিলাদের তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার এবং বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দিয়েছে। ইসলামি বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে মুসলিম নারীদের সমকালীন অবস্থা থেকে ইসলামে নারীর ধারণা ও অবস্থানকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা অথবা যুক্তিতর্ক পেশ করা সঠিক হবেনা। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভুল ধারণা দূর করবে ঃ

১. পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণের সুসংবাদের মতই কন্যা সন্তানের জন্মকে স্বাগত জানাতে হবে। পুত্র সন্তানের জন্ম হলে শুভেচ্ছা জানানো এবং কন্যা সন্তানের জন্ম হলে মুখ গোমরা করে থাকা ইসলামি শিক্ষার বিরোধী। ইসলাম কন্যা সন্তানদের বিশেষ যত্ন নেয়ার তাগিদ দিয়েছে।

২. নবী করিম (সা.) নারীদের সহিত ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে নিকৃষ্ট না ভেবে সমানরূপে গণ্য করতে হবে।

৩. মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

---

১৯. Qutb. *Islam The Misumderstood Religion.* Damascus : The Holy Quran Publishing House. 1977. P-97.

ইসলামের বিবাহ প্রথায় একজন অভিভাবক থাকার অর্থ এ নয় যে, বিবাহের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে। নারীর এককভাবে অধিকার রয়েছে কোন প্রকার চাপমুক্ত থেকে বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার। যদি কোন মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া বাগদান করা হয়, তাহলে এই বাগদান সে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে।

৪. মা হিসেবে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত সম্মানজনক। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মহানবীর (সা.) উক্তি, 'বেহেস্ত মাতাদের পদতলে।' কোনো মুসলমান সর্বাধিক শ্রদ্ধা করবে তার মাকে। পিতার চাইতে মাতার মর্যাদা সন্তানের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি।

৫. একজন বিবাহিত মহিলা তার পারিবারিক নাম বহাল রাখতে পারে এবং তার স্বামীর পক্ষে তা পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। এটাও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শামিল।

৬. যৌনতার নিদর্শনগুলো আড়াল করার জন্য ইসলাম কতিপয় আদব লেহাজ প্রবর্তন করেছে ঃ পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের পোশাক ও চলাফেরার ঢং নকল করা নিষিদ্ধ।

৭. মহিলাদের কর্মকাণ্ড ইসলামি শিক্ষার বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত ইসলামে মহিলাদের ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ এবং বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়নি স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব বিনাশ করে তার সাথে মিশিয়ে ফেলার।

৮. মহিলাদের মাসিকের সময় সহৃদয় ও নম্র আচরণ করতে হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনক্রমে ভালবাসতে না পারে, তাহলে ঐ স্ত্রী তাকে তালাক দিতে পারে।

৯. উত্তম স্ত্রীকে বিশ্বে সর্বোত্তম সম্পদ হিসেবে ইসলাম গণ্য করেছে। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসার পরিচালনা এবং টাকা কড়ির নিয়ন্ত্রণ করা তার দায়িত্ব।

১০. ইসলাম চায় মুসলিম মহিলারা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মেনে চলুক এবং পোশাক পরিচ্ছদ, জুতা পরিধান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ না করুক। এ ধরনের অনুকরণ দুর্বলতার প্রতীক।

১১. ইসলামি সমাজে মহিলাদের পোশাকের কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষণ অন্যতম। নারী ও পুরুষের পোশাকের পার্থক্যের কারণ হচ্ছে পুরুষ ও নারীর আকৃতির ভিন্নতা। একই কারণে কোন মহিলার উচিত নয় তার স্বামী বা কোন মহরম (যার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) পুরুষ ছাড়া ভ্রমণ করা।

ইসলামি আদব ও শৃঙ্খলা

ব্যক্তির আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং যুক্তির প্রতি সাড়া দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামি আদব কায়দা মানুষকে সুসভ্য ও শিক্ষিত করে তোলে। এর ফলে ধৈর্যধারণ, আত্মসন্তুষ্টি ও স্বনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়; অপরিহার্য না হলে অন্যের সহযোগিতা না চাওয়ার ব্যাপারে ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থাকে।

ইসলামের অন্যতম প্রশংসিত গুণ হচ্ছে মানুষের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ এবং তীব্রতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করা। মহানবীর (সা.) ভাষায়, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সেই, যে ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। উত্তম মুসলমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা ও আত্ম-শৃঙ্খলা। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় এবং রমযান মাস আত্মসংযম শিক্ষা দেয়।

শৃংখলার সুফল হচ্ছে ঃ (ক) মিতাচার ও (খ) সময়ের সদ্ব্যবহার। মিতাচার বা সংযম ইসলামি আদবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে একটি সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সৃষ্টি হয়। মানুষের সেবার জন্য এটা প্রয়োজন (কারণ যে ব্যক্তি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট অথবা মেকি আচরণে অভ্যস্ত, সে কেমন করে এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অন্যের সেবা করবে?) এবং আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলতেও এটা প্রয়োজন। সময় হচ্ছে জীবনের মূল্য মূল্যায়নের একটি মানবিক মাপকাঠি। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি করা হবে তা হচ্ছে ঃ সময়কে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছেঃ প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা এবং প্রতিটি শস্যকণার হিসাব রাখা। এটা করতে হবে তার নিজের স্বার্থে এবং সমগ্র জাতির স্বার্থে।

উল্লিখিত নীতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রেখে ইসলামি আদব প্রণীত হয়েছে। নীচে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো ঃ

১. মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন শুরু হয় সূর্যোদয়ের আগে সুবহে সাদেক থেকে এবং শেষ হয় এশার নামাজের পরপরই অর্থাৎ সূর্যাস্তের প্রায় দেড় ঘন্টা পর।

২. নিছক সময় ক্ষেপণের জন্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে; অবশ্য মুসলমানদেরকে একে অন্যের সঙ্গে অহরহ দেখা সাক্ষাৎ করার তাগিদ দেওয়া হলেও তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ করার মাধ্যমেই দেখা সাক্ষাৎকে ফলপ্রসূ করতে হবে।

৩. খাওয়ার সময় অহেতুক দীর্ঘ সময় ব্যয় করা অনুচিত।

৪. কথাবার্তার সংযম প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলা অথবা বলার খাতিরেই কথা বলার বদ অভ্যাস সময়ের অপচয় মাত্র। চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন

উল্লেখ করা যেতে পারে, ইসলাম ব্যক্তির নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নীচে কতিপয় পরিচিত আদবের বিবরণ দেয়া হলো। এই লক্ষ্য অর্জনে যে কোন আচরণের সহায়ক অথচ ইসলামি নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন বিষয় ইসলামি আদবের অংশ। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করা হচ্ছে ঃ

১. ঘুমাবার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, দরজা-জানালা বন্ধ করা হয়েছে, খাবার বস্তু ও পানির পাত্র ঢাকা এবং আগুনের সব উৎস বন্ধ করা হয়েছে।

২. যে বাড়ির ছাদে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নেই, অথবা এমন নির্জন স্থান আছে যেখানে জরুরি পরিস্থিতিতেও কাউকে পাওয়া যায়না, এমন স্থানে ঘুমানো উচিত নয়। তাছাড়া বালিশ, লেপ-তোশক পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, সেখানে কোন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ লুক্কায়িত আছে কি-না।

৩. পাত্র থেকে পানি পান করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ পাত্রে ক্ষতিকর কোন কিছু পড়েনি।

৪. একা একা নয়, বরং যতদূর সম্ভব দলবদ্ধভাবে সফর করা উচিত। যানবাহন এমনভাবে পার্ক করা যাবে না, যাতে অন্যের অসুবিধা বা বিপদের কারণ হয়।

৫. জুতো পরার আগে পরীক্ষা করা দরকার, রাতে অথবা অব্যবহার কালে কোন ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ সেখানে লুক্কায়িত রয়েছে কি-না।
৬. কতিপয় প্রাণী যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর– ক্ষতিকর বিধায় মেরে ফেলতে হবে।

মুসলমানদের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণে ইসলামি আদব

ইসলামি আদবের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে ঃ বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিশ্বের বিভিন্নাঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত ইসলামি আদব লেহাজের ধর্মীয় প্রকৃতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এজন্য পাকিস্তান সফরকারী একজন মরোক্কোবাসী সেখানকার জনগণের আচরণ বুঝতে অসুবিধায় পড়েনা, অথবা বিদেশ বিভূই বলেও মনে হয়না। মিশরের মুসলিম মহিলারা ইসলামি পোশাক পরিহিতা তুর্কি মহিলাদের দেখে বিস্মিত হয় না। ইসলামি সমাজের সদস্যরা প্রতিদিন বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের সংহতি প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় যে, তারা যেসব পন্থায় কাজ করে, তা তাদের ঐতিহ্যের অংশ। ইসলামি আদব মুসলমানদের মধ্যে অভিন্ন সমঝোতা গড়ে তোলে; গঠন করে একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি। স্থানীয় সংস্কৃতি এক ইসলামি সম্প্রদায় থেকে অপর সম্প্রদায়ে ভিন্ন হতে পারে। নামাজ পড়া ও শুভেচ্ছা জানানো, প্রধান প্রধান উৎসব, পানাহারে বিধি নিষেধ (যেমন মদ্য পান), হালাল ও হারাম মেনে চলা– প্রভৃতি সার্বজনীন ইসলামি ঐক্যের উপকরণ। প্রতিটি অঞ্চলে মুসলিম শালীন পোশাক পরিধান করে এবং বেশির ভাগ মুসলিম দেশে যথাযথ ইসলামি পোশাক পরে। স্থানীয় বৈচিত্র্যধর্মী সংস্কৃতি (যেমন খাবারের ক্ষেত্রে পাক-ভারত উপমহাদেশে জনপ্রিয় বিরিয়ানী অথবা পোশাকের ক্ষেত্রে ভারতে মুসলিম নারীদের মধ্যে চালু শাড়ী) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ঃ এর ফলে এক অঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের পার্থক্য বুঝা যায়। কুরআনের ভাষায় আমাদের বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আমরা একে অপরকে চিনতে পারি। এসব বিষয় বিশেষ কোন এলাকার মুসলমানদের চরিত্র ও পরিচয় মুছে দেয়না। ইসলামি আদবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে ঃ অমুসলমানদের আচার আচরণের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা পালন। এর সাথে অবশ্য হস্তশিল্প, প্রযুক্তি,

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানান্বেষণ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। ইসলাম জ্ঞানান্বেষণকে সবসময় উৎসাহিত করে এসেছে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে আচার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার আচরণ তাদের নিজস্ব ইসলামি চরিত্র দ্বারাই পার্থক্য করা যেতে পারে।

মুসলমানদের জীবনে অমুসলমানদের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের অর্থ এ নয় যে, ইসলামি সত্তা মুছে গেল। এর কারণ হচ্ছে ইসলামি জীবনব্যবস্থা এত গভীরভাবে প্রোথিত যে, মুসলমানরা সহজেই তা থেকে ছাড়া পেতে পারেনা এবং এটা গভীরভাবে প্রোথিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের দাবি অনুযায়ী কোন অস্থায়ী উদ্ভাবনা নয়– বরং মানুষে মানুষে, মানুষ ও খোদার মধ্যে মানবিক সম্পর্কের অপরিবর্তনীয় বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, আন্তঃসম্পর্কিত আচরণ ও আদর্শের স্থিতিশীল কাঠামো।

কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে, সোভিয়েত ইউনিয়নে খৃস্টবাদ ও ইসলামের বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা করে দেখুন। উভয় ধর্মই রুশ কম্যুনিজমের আদর্শ কর্তৃক সমভাবে ঘৃণিত ও নির্যাতিত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনৈক্য সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সাথে পূর্বের সোভিয়েত অঞ্চলের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মিল ও ইসলামি ঐক্য একটি প্রমাণিত বাস্তবতা।

মুসলমানদের আচার ও প্রথার ব্যাপারে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাসরত অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের প্রদর্শিত সহিষ্ণুতা তুলনাহীন। ইসলামি রাষ্ট্রের আওতায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ হতে হবে স্বাধীন ইচ্ছা ও আস্থার মাধ্যমে।

ইসলামে প্রত্যেক অমুসলমানের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান পুরোপুরি সংরক্ষিত। তদুপরি ইসলাম তার অমুসলিম নাগরিকদের জন্য পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সীমিত বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব দিয়েছে। অমুসলমানদের রয়েছে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ঃ

১. বিশ্বাস ও ধর্মীয় উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার স্বাধীনতা।

২. ইসলাম বিরোধী হলেও বিবাহ ও তালাকের বিধিসহ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন।
৩. অর্থনৈতিক লেনদেন এবং বেসামরিক ক্ষেত্রে মুসলিম নাগরিকদের ন্যায় তাদের সাথে অভিন্ন আচরণ করা হবে। তবে মদ্যপানের ন্যায় কয়েকটি বিশেষ বিষয় এর বাইরে থাকবে। প্রকাশ্যে মদ্যপান না করা হলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবেনা।
৪. সামাজিক প্রথার ব্যাপারে অমুসলিমগণ তাদের স্বতন্ত্র চরিত্র সংরক্ষণে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এক্ষেত্রে পোশাকের ধরন (যদি তা ইসলামি আইনের বিরোধী না হয়), খাবার পদ্ধতি ও খাদ্য প্রকরণের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

অমুসলিমদের ওপর নিজস্ব 'আদব' চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের অসম্মতি, ধর্মীয় বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াতে সহায়তা করেছে। অথচ ইউরোপীয় শাসনে রাজনৈতিক অথবা সামরিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যকে কাজে লাগানো হয়েছে।

অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর কতিপয় বিধি নিষেধ রয়েছে। এসব বিধি নিষেধের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে– অমুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের কোন অংশ নয়, যদিও ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে ঃ তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা না দেওয়া। এজন্য এ ধরনের অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন তো দূরের কথা, এসব বিধি নিষেধ সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে ভারসাম্য প্রকাশ করে এবং মুসলমানদের ঈমান, কর্মকাণ্ড ও আদবের স্বাতন্ত্র্য ও স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অমুসলিম দেশসমূহে অথবা অমুসলিম কর্তৃপক্ষের অধীনে মুসলমানদের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের পর খৃস্টানদের ধর্ম বিচার সভা (Courts of the Inquisition) যে সব মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করতে এবং খৃস্টান হতে অসম্মতি জানিয়েছিল,

তাদের সকলকে পুড়িয়ে হত্যা করে। মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হয় তাদের নাম, পোশাক, রীতিনীতি পরিবর্তন করতে এবং খৃস্টানদের ন্যায় আচরণ করতে।

ইতিহাস থেকে এ প্রসঙ্গে ইহুদিদের উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। খৃস্টান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহুদিদের পোশাক, নামধাম ও প্রথা পরিবর্তন করে খৃস্টানদের অনুসারী হতে বাধ্য করা হয়। অথচ মুসলিম বিশ্বে তাদের সাথে আচরণ করা হয় অনন্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে। ইহুদিদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রথা মেনে চলার অনুমতি দেওয়া হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনকালে ইহুদি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা স্পেন ছেড়ে গেলে ইহুদিদেরও খৃস্টানদের অনুসারী হতে বাধ্য করা হয়।

আচরণে এই পার্থক্যের প্রমাণ আজো দেখতে পাওয়া যায়। মুসলিম বিশ্বে যেসব ইহুদি বাস করতো তারা এখন সেখানে থাকুক বা ইসরাইলে হিজরত করুক, তাদের ইহুদি নাম রয়ে গেছে। অথচ যারা পাশ্চাত্য বিশ্বে বাস করেছে অথবা এখনও বাস করছে তাদের রুশ, ইংরেজি, জার্মান বা ফরাসি নাম রয়েছে।

ইসলামি আচরণের প্রধান প্রধান বিধির পর্যালোচনা

ইসলামি দিবসের এমন একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা অমুসলিম দেশসমূহের দিবসে যেভাবে দেখা হয় ও পালন করা হয়, তা থেকে আশ্চর্যজনকরূপে পৃথক। দিবসের সূচনা হয় খুব ভোরে (ফজরের নামাজের পর) এবং শেষ হয় রাতের এশার নামাজের পর। ইসলামি পঞ্জিকাবর্ষ চান্দ্র মাস নির্ধারিত চাঁদ অনুসারে হওয়ার ফলে, মাসগুলো বছরের পর বছর চক্রাকারে ঘোরে। মুসলমানদের কাছে সময় অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাদেরকে দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রতিদিন ছক কেটে চলতে হয়। দৈনন্দিন সমস্যা ও অসুবিধা এক পাশে রেখে পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে নামায পড়তে হয়। নামায পড়ার মাধ্যমে এসব সমস্যার জটিলতা হ্রাস পায় ও তা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাপিত হয়। তবে যেহেতু এর প্রেক্ষিত হচ্ছেঃ ইসলাম, সেজন্য দিবস জুড়ে তার বাস্তবায়ন হয়। ঘুম থেকে জাগার পর থেকেই ইসলাম মুসলমানদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে এবং তা অব্যাহত থাকে রাতে অবসর নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত। অবশ্য এই প্রভাব বলয়ের মাত্রার কমবেশি হয়ে থাকে। এই বিভিন্নতাকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

১. কোন্ কোন্ বিষয়ের অনুমতি রয়েছে– অধিকাংশ কাজ এই শ্রেণীতে পড়ে।
২. কোন্ বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।
৩. কোন্ বিষয়ে অনুমোদন নেই বা বিরত থাকতে বলা হয়েছে।
৪. কোন্‌টি বাধ্যতামূলক।
৫. কোন্‌টি নিষিদ্ধ।

মজার কথা এই যে, মানুষের কর্মকাণ্ডের অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ বাধ্যতামূলক ও নিষিদ্ধের শ্রেণীতে পড়ে। এই পাঁচ শ্রেণীর বিভক্তি রেখা নমনীয়। এক ধরনের শর্তে যা নিষিদ্ধ, তা অন্য ব্যতিক্রমী শর্তাধীনে অনুমোদিত, এমনকি বাধ্যতামূলক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসলমানদের শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি কোন মুসলিম অনাহারের সম্মুখীন হয় এবং শূকরের মাংস ছাড়া জীবন বাঁচানোর কোন পথ না থাকে, তাহলে তার জন্য এই মাংস খাওয়া বৈধ।

মুসলমানদের আচরণ যেসব সাধারণ বিধি দিয়ে পরিচালিত, সেগুলো নিছক স্বেচ্ছাচারী নির্দেশে তাড়িত নয়। সেগুলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। এগুলো মানুষের প্রতি আল্লাহর রহমতস্বরূপ এসেছে। কোন মুসলিম তার নিজস্ব অবস্থান অথবা বাইরের চাপে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে, অনিবার্য ও বাধ্য হয়ে, যদি ইসলামি বিধান লংঘন করে, তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবেনা।

বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামি বিধি বিধান পালন সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক নয়। তার পরেও ইসলামি পরিবেশে শিশুদের গড়ে ওঠার এবং পরে যাতে ইসলামি বিধান পালন করতে পারে, তার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামি আচার আচরণ যেসব বিধি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিচালিত তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করা (তাড়াহুড়া না করা) প্রয়োজন।
২. অন্যের সাথে আচার ব্যবহারে প্রত্যেক মুসলমানকে ভদ্র ও সহৃদয় হতে হবে।
৩. মুসলিম জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হবেঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; শরীর, স্থান ও পোশাকের পবিত্রতা।

৪. সৌন্দর্যশীলতা, রুচিশীলতা এবং শৃংখলা মুসলিম জীবনের জন্য মূল্যবান এবং যতদূর সম্ভব এসব গুণ অর্জন করতে হবে।

৫. ইসলামের মতে, সৌজন্যের সাথে কোন সৎ কাজ করলে সেটা আরো সৌন্দর্যময় হয়। অপরদিকে ধৃষ্টতা কোন কাজের ভাল দিক ধ্বংস করে।

৬. প্রত্যেক মুসলমানের কাজে বিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, ঔদ্ধত্যের নয়।

৭. কোন মুসলমানের এমন কাজ করা উচিত নয়, যার ফলে তার নিজের অথবা অন্যের শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক ক্ষতি হয়।

৮. মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে অহেতুক কথা বলার চেয়ে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

৯. অপরের কাছ থেকে যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা করা হয়, অন্যদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করতে হবে। নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয়, পরের জন্য তাই করতে হবে। অন্যের সঙ্গে বিচার বিবেচনা ছাড়া সদাচরণ সম্ভব নয়।

১০. কোন মুসলমান নিজে যা করতে পছন্দ করে না, তা করতে অন্যকে আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারেনা।

১১. কোনকিছু গ্রহণ, দান, করমর্দন, খাবার, পানি পান ও হাঁটা প্রভৃতি কাজে ডান হাত এবং পায়খানায় গিয়ে বাম হাত ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

১২. খাবার গ্রহণ, পানি পান এবং পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অহংকার বা ঔদ্ধত্য না থাকলে তা অনুমোদিত। বাহুল্য ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

১৩. অমিতব্যয়িতাকে ঘৃণা করা হলেও এর অর্থ এ নয় যে, কোন মুসলমান জীবন উপভোগ করতে পারবে না অথবা তার অর্থ বা সম্পত্তি থাকবে না। তার ওপর আল্লাহর রহমতের নিশানা থাকা প্রয়োজন।

১৪. উদার হওয়া এবং কৃপণ না হওয়া একটি গুণ।

১৫. মুসলমানদের জীবন খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তার কোনরূপ কষ্ট থাকুক বা না থাকুক। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে কৃতজ্ঞ হতে হবে।

১৬. প্রত্যেক মুসলমানকে সব সময় আস্তিক হতে হবে।

১৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানকে হতে হবে সংযমী ও স্বাভাবিক। ইসলামে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই।

১৮. মুসলমানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে এবং শুধু জরুরি প্রয়োজনের সময়েই অন্য মুসলমানের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

১৯. ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুকরণ বা নকল করা নিষিদ্ধ।

২০. আনুগত্য এবং অপরের আদেশ বা ইচ্ছার বাস্তবায়ন ইসলামি শিক্ষার বিরোধী নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২১. পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঁটা-চলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী কর্তৃক পুরুষ অথবা পুরুষ কর্তৃক নারীর বেশ ধরা নিষিদ্ধ। লিঙ্গগত চিহ্ন বজায় রাখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

২২. ইসলামি আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ শৃঙ্খলার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভারসাম্য ও সমন্বয় করা।

২৩. ইসলামি আদবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ নমনীয়তা ও সহিষ্ণুতা। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, কোন বিশেষ ধরনের আচরণ সহনীয় বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যদি তা মার্জিত (অন্যের প্রতি বিবেচনা প্রসূত) এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ (ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি নির্বিরোধ) হয়। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছেঃ এই আচরণ হারাম বা নিষিদ্ধ শ্রেণীতে পড়বে না।

বিভিন্ন দৈহিক কার্যক্রম

হাঁচি

ইসলামের মতে, হাঁচি[১] হচ্ছে আল্লাহর রহমত বিশেষ। এ সংক্রান্ত পালনীয় হচ্ছে ঃ

১. কোন মুসলমানের হাঁচি প্রতিরোধ বা ঠেকানো উচিত নয়। এটা একটা স্বাস্থ্যগত প্রক্রিয়া। যেভাবেই হোক, হাঁচি স্বেচ্ছায় দেয়া যায়না বা এটা সহজেই দমিয়ে দেওয়া যায়না।[২]

২. হাঁচির সময় প্রত্যেক মুসলামানের উচিত তার মুখ সরিয়ে নেয়া অথবা তার মুখ ও নাক হাত বা রুমাল দিয়ে ঢেকে দেয়া। এর ফলে আওয়াজ কম হবে এবং পার্শ্ববর্তী লোকজনের বিড়ম্বনা এড়ানো যাবে।

৩. হাঁচি যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ, সেজন্য মুসলমানদের একথা বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে ঃ আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)

৪. কোন মুসলমান হাঁচি দেওয়ার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, নিকটবর্তী যারা এটি শুনবে তাদের বলতে হবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন)। এর সুষ্ঠু প্রত্যোত্তর হলো ঃ ইয়াহ্‌দিকুমুল্লা ওয়া ইয়ুসলিহ বালাকুম (আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দিন এবং তোমার মঙ্গল করুন)

---

১. বক্ষ ও মুখমণ্ডলের মাংসপেশী দিয়ে নাক দিয়ে অনৈচ্ছিক যে বায়ু নির্গত হয় তাই হাঁচি। কাফেরের ন্যায় হাঁচি হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। নাকের ভেতর দিয়ে ফুসফুসের উপযোগী সহনশীল অবস্থা সৃষ্টির জন্য বাতাস বের করে দেওয়া হয়। শরীরের উপযোগী বাতাস উত্তপ্ত হয়ে সম্পৃক্তির কাছাকাছি আর্দ্র হয় এবং ধূলিকণা ও জীবাণুযুক্ত হওয়ার পর তা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। Encyclopedia Americana vol. 25. p. 107.

২. প্রাগুক্ত।

৫. কোন ব্যক্তি সর্বাধিক তিনবার হাঁচি দিলে এই দোয়া পড়া উত্তম। এর বেশি হলে সম্ভবতঃ এর অর্থ দাঁড়ায় তার সর্দি লেগেছে।
৬. কোন মুসলমান হাঁচি দেওয়ার পর আলহামুদুলিল্লাহ না বললে তার জবাব দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।
৭. কেউ হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে, তাহলে তার কাছের মুসলমানদের উচিত তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
৮. কোন অমুসলমান হাঁচি দিলে তার মঙ্গল কামনায় বলতে হবে 'ইয়াদিকুমুল্লাহ' (খোদা তোমাকে হেদায়েতের পথে চালিত করুন)।

হাই তোলা

হাই তোলা[৩] খারাপ অভ্যাস হিসেবে বিবেচিত এবং এ জন্যে যতদূর সম্ভব তা দমন করতে হবে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঃ

১. যতদূর সম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. হাই তোলার সময় তার মুখের ওপর হাত দিয়ে ঢাকতে হবে।
৩. হাই তোলার সময় যাতে কোন শব্দ না হয়, তার চেষ্টা করতে হবে।

বিছানায় গমন (প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি)

১. প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই বিছানায় আশ্রয় নেয়ার আগে ইস্তিঞ্জা করতে তথা মল-মূত্র ত্যাগ করতে হবে।
২. অজু করার মাধ্যমে পবিত্র অবস্থায় বিছানায় গমন আবশ্যক।
৩. ভরপেটে শুতে না যাওয়া স্বাস্থ্য বিধিসম্মত।

কখন ঘুমাতে হবে

১. এশার নামাজ পড়ার আগে শুতে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ এর ফলে নামাজ কাজা হতে পারে।

---

৩. ফুসফুসে অনৈচ্ছিক বায়ুর প্রবেশের ফলে প্রায়ই হাত পায়ের প্রসারণ ঘটে এবং হাই তুলতে হয়। বেশি আলস্য, স্বল্পমাত্রায় অক্সিজেন সরবরাহ এবং কতিপয় রোগের ফলে হাই তোলার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। হাই তোলার সময় অসাবধানবশতঃ মুখ বেশি হা করলে চোয়াল আটকে যেতে পারে এবং ঘাড়ের পিছনে মারাত্মক ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। Encyclopedia Americana : vol. 29. p. 6556.

২. দিবসে যখন নামাজের সময় শুরু হয়, সেই সময় ঘুমানো যাবেনা নামাজ পড়া ছাড়া। এসময় ঘুমিয়ে পড়লে নামাজ তরক হতে পারে।

৩. জোহর, আসর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে অল্পক্ষণ আরাম করা বা ঘুমানো যেতে পারে। এর ফলে চোখ ও শরীর আরাম লাভ করে এবং দিবসের বাকী কাজ সম্পাদনের জন্য তা দেহে সজীবতা এনে দেয়।

৪. প্রয়োজনীয় কাজ করে অথবা কোন অতিথিকে আপ্যায়ন করে এশার নামাজের পর পরই মুসলমানদের ঘুমিয়ে পড়া উচিত। এভাবে তারা সজীবতা লাভ করতে পারে এবং দিনটি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে।

বিছানা

১. সাধারণ ডিজাইন ও নির্মাণের মাধ্যমে বিছানা তৈরি করতে হবে। এটা খুব বেশি আরামদায়ক অথবা অস্বস্তিকর হওয়ার প্রয়োজন নেই। আলস্য বা পরিশ্রমবিমুখতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রয়োজনীয় আরামের উপযোগী আরামদায়ক হলেই হয়।

২. বিছানাটি মেঝে থেকে খুব উঁচুতে হওয়া উচিত নয়– বিনয়ের লক্ষ্যে এটা করা উচিত।

৩. বিছানা এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত নয়, যাতে শরীরের একাংশ রোদে এবং অপরাংশ ছায়ায় পড়ে।

৪. নিরাপত্তার জন্য যে সব ছাদে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নেই, সে সব স্থানে শয়ন চলবেনা। তেমনিভাবে যেসব নির্জন স্থানে হঠাৎ অসুস্থতা, অনুপ্রবেশ-কারীদের হামলা অথবা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জরুরি অবস্থার সময় সাহায্য পাওয়া যায় না– এসব স্থানে শয়ন করা উচিত নয়।

৫. পল্লী এলাকার মত অনেক স্থানে নিকটবর্তী কোন বাথরুম না থাকলে বিছানার নীচে একটি উপযুক্ত পাত্রে পানি রাখা প্রয়োজন। অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং যারা দরজার বাইরে ঘুমান তাদের জন্য এটা বেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

ঘুমাতে যাবার আগে

প্রত্যেক মুসলমানকে নিম্নোক্ত বিধি মানতে হবেঃ

১. লেপ-তোশক-বালিশ ঝেড়ে দেখতে হবে তার নীচে কোন ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ লুকায়িত আছে কিনা।

২. নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে হবে ঃ বিসমিকা আল্লাহুম্মা আহইয়া ওয়া বিসমিকা আমুতু (হে খোদা, তোমার নামেই আমি বেঁচে আছি ও মৃত্যুবরণ করব)।

৩. ডান দিকে পাশ করে শোয়া।

৪. উপুড় হয়ে না শোয়া।

৫. জোর করে ঘুমাবার চেষ্টা না করা। শরীরের চহিদা অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুম এসে যাবে।

৬. খোদার নাম নিয়ে শুতে হবে এবং ঘুম না আসা পর্যন্ত তাঁর নাম নিতে হবে। এর ফলে শিথিল ভাব আসবে এবং দিনের সমস্যা ও জটিলতার চিন্তা দূর হবে।

৭. শরীরের প্রকৃত চাহিদা অনুসারে (কম বা বেশি নয়) নিজের ঘুম নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘুম থেকে জাগা

১. ভোরে ঘুম থেকে জাগতে হবে। এর ফলে সারা দিনের কাজের উপর ইতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয় এবং যারা একাজ করেন তাদের কাছে এটা অনুধাবন সহজ।

২. আগের দিনের ন্যায় নতুন দিনে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করতে হবে এবং তার শোকরানা আদায় করতে হবে।

৩. ফজরের নামাজের জন্য অজু করার আগে টুথব্রাশ বা মেছওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। রাতের বেলা দীর্ঘ সময়ের জন্য জাগলে এরূপ করা উচিত।

৪. যদি কোন প্রবহমান পানি না পাওয়া যায়, তাহলে ঘুম থেকে জেগে প্রথমে নিজের হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। পাত্রে সংরক্ষিত পানিতে হাত ডুবানোর আগেই তা করতে হবে। এর কারণ কেউ জানেনা, রাতে তার হাত কি স্পর্শ করেছিল।

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখা

১. এমন স্বপ্ন দেখার ভান করা যা সে দেখেনি, সেটা পাপ। ইসলাম সবরকম মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছে।

২. কেউ যদি মঙ্গলকর স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা বলা উচিত তার পছন্দনীয় ব্যক্তির কাছে। আর যদি অমঙ্গলের কিছু দেখে, তাহলে তার ক্ষতি থেকে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে খোদার কাছে পানাহ চাওয়া উচিত।

৩. শুধু বন্ধুর কাছে অথবা প্রজ্ঞাবান লোকের কাছেই স্বপ্নের কথা বলা যেতে পারে।

৪. যে স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন শুধু তার জন্যই, অন্যের জন্য নয়। যদি কোন মুসলমান মনে করে যে, সে মহানবীকে (সা.) দেখেছে অথবা তার কাছ থেকে একপ্রকার নির্দেশ বা পরামর্শ পেয়েছে, তাহলে তা তার মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে এবং অন্যের কাছে তা বলবে না। ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং স্বপ্নকে কখনই ইসলামি শিক্ষার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

মলমূত্র ত্যাগ

মল-মুত্র ত্যাগের জন্য উপযুক্ত স্থান হচ্ছে বিশেষভাবে ডিজাইনকৃত ও নির্মিত অথবা বাড়ির প্রান্তে তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান মানতে হবে ঃ

১. পায়খানায় প্রত্যেক মুসলমানকে প্রথম বাম পা ফেলে প্রবেশ করতে হবে, বিসমিল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়েছ (আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, হে আল্লাহ তোমার কাছে সব রকম কুচিন্তা ও কুকর্ম থেকে পানাহ চাই)।

২. কাউকে সাথে নিয়ে পায়খানায় যাবে না অথবা শরীরের গোপনাঙ্গ অন্যের সামনে উন্মুক্ত করবে না, যেমনটি পেশাবখানায় গিয়ে মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্থায়ীভাবে নির্মিত পাত্রে প্রস্রাব করে। এ ধরনের পেশাবখানায়, একজন আরেকজনকে যাতে না দেখতে পায়, এমন মোটা স্ক্রীন বা পর্দা টাঙ্গাতে হবে।

৩. খোলা পায়ে পায়খানায় প্রবেশ উচিত নয়। ধূলা-ময়লা বা মারাত্মক রোগ জীবাণু যাতে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যে এই সাবধানতা।

৪. পায়খানায় প্রবেশের আগেই পোশাক খুলে ফেলা চলবে না। সর্বাধিক গোপনীয়তা ও শিষ্টাচার পালন করা প্রয়োজন।

৫. এরপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। পেশাব করার পর গোপনাঙ্গ পানি দিয়ে ধৌত করা এবং পায়খানার ক্ষেত্রে প্রথমে টয়লেট পেপার ব্যবহার ও পরে সাবান ব্যবহার করলেও চলে (পানি বা সাবানের অভাবে ঢিলা বা বালি ব্যবহার করা যেতে পারে– অনুবাদক)।

৬. পেশাব-পায়খানার সময় অথবা হাত ধৌতকালে ডান হাত ব্যবহার করা যাবে না। খাবার গ্রহণ, পানাহার, পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা প্রভৃতি ভাল কাজে ডান হাত ব্যবহার করতে হবে। মলমুত্র ত্যাগের পর পরিচ্ছন্ন হওয়া, নাক ঝাড়া প্রভৃতি কাজে বাম হাতের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে– যা ইসলামি বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৭. শরীর বা পোশাকে কোন প্রকার ময়লা যাতে না লাগে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং পরে পাকসাফ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করা কাঙ্ক্ষিত নয়।

৮. কোন মুসলমানের পক্ষে তার গোপনাঙ্গের প্রতি তাকানো অরুচিকর।

৯. কেবলামুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করা মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ। কিবলাহ মুখী অথবা কিবলাকে পিছন ফেলে পেশাব পায়খানা নিষিদ্ধ। সুতরাং বাকী দু'দিকে এই কাজ সারতে হবে।

১০. পায়খানার পর উঁচু হয়ে বসে পানি ব্যবহার করা উত্তম। তবে (বৃদ্ধদের বেলায়) বসে থেকে শারীরিক অসুবিধা হলে দাঁড়িয়ে পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়।

১১. জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পেশাব-পায়খানার সময় কোন মুসলমানের পক্ষে হাঁটা চলা উচিত নয়। এ সময় কোন কিছু পড়াও নিষেধ।

১২. পায়খানা ছেড়ে না আসা পর্যন্ত কোন মুসলমান অন্য কারো স্বাগত সম্ভাষণের জবাব দেবে না। ফিরে এসে সে ক্ষমা চেয়ে তার প্রত্যোত্তর দেবে।

১৩. নিজের শরীর পুরোপুরি আবৃত করার পরেই মুসলমানদের পায়খানা ছেড়ে আসতে হবে।

১৪. গোসলকালে কোন মুসলমানের উচিত নয়, একইস্থানে পেশাবের পানি প্রবাহিত করা।

১৫. পায়খানা থেকে বের হয়ে তাকে বলতে হবে গোফরানাকা (হে খোদা, আমার গুণাহ মাফ কর)।

বহির্ভাগে এস্তেঞ্জা

বন-জঙ্গল, মরুভূমি ও শিবিরের দিনগুলোতে এস্তেঞ্জার জন্য মুসলমানদের কতিপয় বিধি পালন করতে হয় ঃ

১. স্থির পানি, গাছের ছায়া, জনসাধারণ যেখানে চলাচল করে এমন স্থান বা সড়ক, কোন পশু-পাখি বা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর বাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত গহ্বর বা গর্ত এবং বাঁকিয়ে গেছে এমন স্থানে এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ। কারো কোনো প্রকার ক্ষতি করা অথবা ক্ষতির পরিবেশ সৃষ্টি করা চলবে না।

২. যেখানে কাউকে নগ্ন অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় না এমন স্থানে এবং গোপন অবস্থায় এস্তেঞ্জা করতে হবে।

৩. এমন স্থানে বসা উচিত, যাতে নিজের গায়ে অথবা কাপড়-চোপড়ে ময়লা না লাগে।

মাসিক রক্তস্রাব[৪] এবং প্রসূতি কাল

মাসিক রক্তস্রাব ও প্রসূতি অবস্থা নারীর স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে গণ্য। তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই দু'টি পর্যায়ে মহিলাদের প্রতি নিম্নোক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে ঃ

১. এ অবস্থায় নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কুরআনে পাঠ এবং মসজিদে অবস্থান নিষিদ্ধ।

২. কাবা প্রদক্ষিণও নিষিদ্ধ। এমনকি হজ্ব .করতে গিয়ে যে নারীর মাসিক হয়েছে, তার জন্যও। কাবা পরিক্রমা ছাড়া তারা হজ্বের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন। পুরুষের বীর্য বের হওয়ার পর অপবিত্র অবস্থায় থাকলেও এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য।

---

৪. রক্তস্রাব হচ্ছে জরায়ু থেকে সাময়িক রক্ত ও রক্তের ন্যায় তরল পদার্থের নিঃসরণ। এটা মহিলাদের ডিম্ব-উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়। এটা জরায়ুর চর্ম কুঞ্চনের ফলে পরিভ্রষ্টতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেক মেয়ের ১১ বছর বয়সে বা তার আগেই রক্তস্রাব শুরু হয়। আবার অনেকের ১৬ বছর বা তারও পরে হয়, তবে মূল সময়টি ১৩ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এই রক্তস্রাবের মেয়াদকাল নিয়ে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ৩ থেকে ৫ দিন স্থায়ী থাকে ঃ Encyclopedia Americana : vol. 18. p. 636.

৩. এ সময় যৌন সঙ্গম নিষিদ্ধ। এ সময় স্বামী ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে আলিঙ্গন, চুম্বন এবং কটিদেশের ওপর পর্যন্ত স্পর্শও করতে পারেন।
৪. মাসিক শেষ হওয়ার পর নারীরা রোজা রাখতে পারে, তবে গোসল না করা পর্যন্ত নামাজ পড়তে পারবে না। গোসলের পর রমযানের কাজা রোজাগুলো পূরণ করতে হবে, তবে কাজা হওয়ার নামাজ পড়তে হবে না।
৫. প্রত্যেক মুসলিম মহিলার কর্তব্য হচ্ছে রক্তস্রাব বা প্রসূতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গোসল করা এবং সারা শরীর ও চুল ধৌত করা। এসময় তার গোপনাঙ্গে একটি কাপড়ের সঙ্গে মৃগনাভি (মৃগনাভি না পাওয়া গেলে অন্য কোন প্রসাধনী) ব্যবহার করতে হবে। গোসলের পর মাসিক বা প্রসূতি অবস্থায় আরোপিত সকল বিধিনিষেধ শেষ হয়ে যায়।
৬. মাসিক চলা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করা উচিত।
৭. যে নারীর মাসিক হয়েছে, তাকে শোকরানা অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে অংশগ্রহণের জন্য নয়; অবশ্য শর্ত হচ্ছে এই অনুষ্ঠান মসজিদে হবে না।

পুরুষের অপবিত্র অবস্থা

কোন মুসলমান পুরুষ ঘুমাবার কালে, বৈধ ভালবাসার প্রক্রিয়া অথবা অন্য কোন কারণে বীর্যপাতের দরুণ অপবিত্র হয়ে পড়লে তাকে খুব তাড়াতাড়ি গোসল করতে হবে। এ অবস্থায় গোসলের আগে তার নামাজ পড়া, কুরআন পাঠ বা স্পর্শ করা, কাবা শরীফ তাওয়াফ করা অথবা মসজিদে অবস্থান করা যাবে না।

মহিলাদের বেলায় একই বিধান প্রযোজ্য। কোন মহিলা ঘুমাবার কালে অথবা যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে বীর্যপাত হওয়ার দরুণ অপবিত্র হলে অথবা স্বামী তার যৌনাঙ্গে লিঙ্গ প্রবেশ করালে, বীর্যপাত না হলেও তাকে গোসল করতে হবে এবং তাকে উপর্যুক্ত বিধি মানতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

মানুষের প্রগতি ও তার মানব-প্রকৃতির অন্যতম গুণ এবং জীবজন্তু থেকে পার্থক্যকারী চিহ্ন হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা।

অপবিত্রতা

মুসলমানকে অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকতে এবং নিজেকে, নিজের কাপড় চোপড় ও তার বাসস্থান অথবা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নাপাক ময়লা থেকে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন রাখবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এসব অপবিত্র বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বমি উদ্রেককারী ঔষধ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্রগন্থির তরল পদার্থ, প্রস্রাব, মাদক জাতীয় দ্রব্য, মানুষের মল, জীবজন্তুর মল, রক্ত, পূঁজ এবং খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ জীবজন্তুর দুধ। মাছ ও কীট পতঙ্গ এবং ভেড়া, ছাগল ও হাতীর পশম ছাড়া জীবন্ত কোন প্রাণীর কেটে ফেলা অঙ্গ অপবিত্র। ইসলামি বিধান মোতাবেক জবেহ করা ছাড়া সকল জন্তু হারাম। এসব হারাম জিনিসের কোন অংশ যদি কোন মুসলমানের শরীরে বা কাপড়ে পড়ে তাহলে তা ধুয়ে ফেলা ফরজ।

গোসল করা

১. নানা কারণে মানবদেহের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। রোগ বালাইয়ের মোকাবেলায় শরীর রক্ষা করা ছাড়াও সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশার জন্য এটা প্রয়োজন।

২. সুতরাং বার বার গোসল করাই দুর্গন্ধ থেকে বাঁচবার উপায়।

কোথায় গোসল করবেন

১. পুরুষেরা একটি পর্দা টানিয়ে অথবা জাঙ্গিয়া পরিধান করে পাবলিক গোসলখানায় গোসল করতে পারে।

২. গোসলখানা মাটির তৈরি হলে সেখানে পেশাব করা যথার্থ নয়; কারণ এর ফলে ঐ স্থান দূষিত হবে। স্থানটি পাকা মেঝে হলে এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে পেশাব করা নিষিদ্ধ নয়।

গোসল কখন ফরজ হয়

সমগ্র শরীর ধুয়ে ফেলা নিম্নোক্ত কারণে জরুরি হয়ে পড়ে ঃ

১. বীর্যপাতের পর, ঘুমের সময় অথবা স্বপ্নে বীর্যপাত হলেও, তা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য।

২. মহিলাদের ক্ষেত্রে যৌন সংক্রান্ত কোন স্বপ্ন দেখলে এবং সেই সাথে তরল পদার্থের চিহ্ন পেলে, মহিলাদের রক্তস্রাব শেষ হলে এবং প্রসূতির অবস্থার মেয়াদ শেষ হলে।

এছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও গোসল জরা জরুরি। এর মধ্যে ইসলামের দু'টি ঈদ, ইসলাম গ্রহণ এবং প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের আগে গোসল করা প্রয়োজন।

গোসলের নিয়ম

প্রত্যেক মুসলমানকে নিম্নোক্ত বিধি মানতে হবে ঃ

১. গোসলের আগে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে অন্যদের থেকে নিজেকে আড়াল করেছে।

২. পরিষ্কার স্থানে কাপড় চোপড় ও তোয়ালে রাখতে হবে।

৩. প্রথম পর্যায়ে গোসলের আগে অপবিত্রতা, ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪. তিনবার হাত ধুতে হবে।

৫. কুলি করতে হবে এবং নাক পরিষ্কার করতে হবে।

৬. মুখমণ্ডল ও হাত ধুতে হবে।

৭. ডানদিক থেকে শরীরের ওপর পানি ঢালতে হবে।

৮. শরীর ও চুলের সকল অংশে পানি পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে পানি প্রবেশ করাতে হবে।

৯. সাবান ব্যবহারকালে পরিষ্কার পানি দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলতে হবে, যাতে সাবানের কোন চিহ্ন শরীরে না থাকে। ফরজ গোসলের সময় এটা জরুরি।

১০. বাথ' টাবে গোসল করা যেতে পারে; তবে শর্ত হলো শাওয়ারের সাহায্যে দেহের সব অপবিত্রতা ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে।

শরীরের কোন কোন অংশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ

শরীরের যেসব স্থানে প্রধানতঃ ময়লা জমে, সেসব স্থান পরিষ্কার করা জরুরি। যেমন ঃ

১. প্রয়োজন বোধে চুল ছেঁটে ফেলা।

২. বগল ও নিম্নাঙ্গের চুল সপ্তাহান্তে (অনুর্ধ্ব ৪০ দিনে) তুলে ফেলা; এটা সম্ভব না হলে সেভ করতে হবে।

৩. নখ কাটা। নখ কাটা জরুরি হয়ে পড়লে মুসলমানদেরকে প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত এবং এরপর ডান পা এবং তারপর বাম পায়ের নখ কাটতে হবে।

শরীরের অন্যান্য অংশ বিশেষ করে মুখমণ্ডল, মাথা, হাত ও পা পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ জরুরি। এরূপ করলে শরীর ও মন বিশেষভাবে সতেজ থাকবে; তদুপরি শরীরের এসব অংশ অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশি কাজে লাগে। অন্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মুখ ব্যবহার করা হয় বলে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।[১]

মুখ পরিষ্কার রাখা এবং স্মিত হাসির জন্য দুটো পরিপূরক পন্থা রয়েছে।

১. খাবার পর খিলাল ব্যবহার করা।

২. মুখের ডান দিক থেকে মিসওয়াক বা টুথব্রাশ ব্যবহার করা।

এই পদ্ধতির কোনটাই একে অপরের বিকল্প নয়, একে অপরের পরিপূরক; যত্রতত্র টুথব্রাশ নিয়ে যাওয়া অবান্তর ও কঠিন; তবে মিসওয়াক যেকোন স্থানে

---

১. দেখা গেছে পেছন দিকের (পাছা) চাইতে মুখ গহ্বরে অনেক বেশি সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে। এজন্য দন্তবিদরা মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বিশেষ করে আহার গ্রহণের পর যাতে দাঁতে কোন কিছু লেগে না থাকে, সেজন্য দাঁত ব্রাশ করতে হবে।

সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়। তদুপরি কারো সাথে সাক্ষাতের আগে মুখের দুর্গন্ধ পরিশোধন অথবা কর্মস্থল থেকে ফিরে আসার পর মিসওয়াক সহজেই ব্যবহার করা যায়।

মানুষের প্রসাধনী ও সাজসজ্জা

নারী ও পুরুষের জন্য এ ব্যাপারে বিশেষ বিধিমালা এবং উভয়ের জন্য সাধারণ বিধিমালা রয়েছে।

চুল

১. মাথার চুলের একাংশ ছেঁটে ফেলা এবং আরেকাংশ না ছাঁটা কেশবিন্যাসের ইসলামি নীতি নয়। হয় সব চুল ফেলে দিতে হবে অথবা সব রেখে দিতে হবে।

২. চুলের পরিচর্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চুল আঁচড়ানো, তেল ব্যবহার করা, চিরুনী পরিষ্কার রাখা হচ্ছে ইসলামি আচরণ। তবে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

৩. কেশবিন্যাসের বিশেষ কোন ইসলামি স্টাইল নেই। তবে মহানবী (সা.) তিন ধরনের কেশবিন্যাস করতেন ঃ ওয়াফরা (কানের নীচ ছাড়িয়ে চুল), লিমমা (কানের লতির নীচ পর্যন্ত চুল) এবং জুম্মা (কাধ পর্যন্ত বিস্তৃত চুল)।

দাঁড়ি

১. দাঁড়ি একজন পুরুষের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের উপকরণ। সুতরাং দাঁড়ি কেটে ফেলা উচিত নয়।

২. দাঁড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত করে রাখতে হবে।

৩. কোন ব্যক্তির তার দাঁড়িতে পাকা চুলের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত নয় এবং সেগুলো তুলে ফেলাও সঙ্গত নয়।

সুগন্ধি

১. সর্বোত্তম সুগন্ধি হচ্ছে কস্তুরী বা মোশ্ব আঁতর। প্রত্যেক লোককে মাঝে মাঝে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হয়। কেউ যদি তাকে সুগন্ধি ব্যবহার করতে দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত এবং প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, কেননা এটা এক উত্তম জিনিস।

গোঁফ

১. গোঁফ খুব বড় হতে দেওয়া উচিত নয়। উপরের ওষ্ঠাধর যাতে দৃশ্যমান হয়, সেজন্য গোঁফ খাট রাখতে হবে।

সীল মোহরযুক্ত আংটি

১. কোন মুসলমান বিয়ে বা বাগদত্তা না হলেও তার পক্ষে আংটি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

২. পুরুষদের জন্য সোনার আংটি পরা নিষিদ্ধ। মূলতঃ মেডিকেল বা ডেন্টাল কারণ ছাড়া পুরুষরা স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. লোহা ও সোনা ছাড়া যে কোন ধাতু দিয়ে আংটি তৈরি করা যেতে পারে।

৪. আংটি বাম অথবা ডান হাতের আঙ্গুলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মহিলাদের মেকআপ ও রূপচর্চা

১. কোন রকম পরিবর্তন বা সংযোজন ছাড়াই যেমন আছে তেমন সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবে রেখে দেওয়া উচিত।

২. মহিলারা রূপচর্চা করতে পারে; তবে তা করতে হবে বাড়িতে। একজন মহিলা বাড়িতে তার স্বামীর সামনে নিজেকে সৌন্দর্যময়ী করে তুলতে পারে। মুখমণ্ডলে প্রসাধনী ব্যবহার করে, নিজেকে পরিচ্ছন্ন রেখে এবং আকর্ষণীয় সুগন্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে।

৩. মহিলারা মেহেদী দিয়ে তাদের হাত রঞ্জিত করতে পারে।

৪. একজন মহিলা তার মহরম পুরুষ আত্মীয়ের সামনে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।

চুল

১. নারীদেরকে তাদের চুল পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। মূলতঃ মহিলাদের চুল হচ্ছে পুরুষের দাঁড়ির ন্যায় সৌন্দর্যের একটি উপকরণ।

২. কোন মহিলার যদি ছোট চুল থাকে, তাহলে তার পরচুলা ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্য কোন মহিলা তার মাথায় পরচুলা লাগাতে সাহায্য করতে বললে তার তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

মুখমণ্ডল ও হাত

১. মহিলাদের মুখমণ্ডল পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ যত্ন নেয়া উচিৎ।

২. কোন মহিলার মুখমণ্ডলে চুল গজালে এ জন্য তার লজ্জিত হওয়া বা সেগুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করা উচিত নয় বা তুলে অন্য মহিলাকে দেবেনা। প্রকৃতির জন্য তার লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

৩. কোন মহিলা অন্য কোন মহিলাকে উল্কি এঁকে দেবেনা বা নিজে উল্কি আঁকবে না।

৪. কোন মহিলার উচিত হবে না তার ভ্রু তোলা।

৫. নখ বড় করা যাবে না; সেগুলো ঘন ঘন কাটতে হবে।

৬. গৃহের বাইরে মহিলাদের প্রসাধন নিষিদ্ধ, তবে চোখে কাজল দেওয়া যেতে পারে।

৭. সৌন্দর্য বিধানের জন্য দাঁতের অগ্রভাগ সুচালো করা এবং তার মধ্যে ফাঁক রাখার অনুমতি নেই।

৮. মহিলাদের মুখ পরিচ্ছন্ন ও নীরোগ রাখতে হবে।

প্রসাধনী

১. মহিলারা গৃহাভ্যন্তরেই প্রসাধন করতে পারে; তবে এ সময় কোন আগন্তুক বা গায়ের মহরম পুরুষ থাকলে চলবে না।

২. কোন মহিলা প্রসাধন শোভিত হয়ে প্রসাধনীর গন্ধ দূর না করে তার বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। এমন কোন রূপচর্চা করা যাবে না, যাতে পর পুরুষ আকৃষ্ট হয়। কেননা সমাজকে দূষিত করার ধাপ এখান থেকেই শুরু হয়।

নারী-পুরুষের জন্য সাধারণ নির্দেশ

১. পাকা চুল কালো ছাড়া যে কোন রং করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পছন্দনীয় রং হচ্ছে উজ্জ্বল লাল ও মেহেদী।

২. মাঝে মাঝে চোখে সুরমা দেয়া যেতে পারে, কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি এবং চোখকে সৌন্দর্যশালী করে তোলে।

খানাপিনার আদব

উত্তম খানা তৈরির জন্য খাবারের পরিমাণ এবং কত প্রকারের খানা হবে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা, পারিপাট্য এবং পরিমিতিবোধের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

১. বৈধ বস্তু থেকে খাবার প্রস্তুত করতে হবে। শূকরের মাংস, মদ, শূকর ছানা থেকে তৈরি জেলী, মদের সাহায্যে তৈরি মিষ্টিপণ্য, রক্ত, সাপ ও ব্যাঙ ইসলামে ভক্ষণ হিসেবে নিষিদ্ধ জন্তু। অনৈসলামি পন্থায় জবাই করা জন্তুর মাংস ভক্ষণও সিদ্ধ নয়।

২. অমুসলমানদের হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহারের আগে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। কারণ পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্যের ব্যাপারে মুসলমানদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে, যা অন্যেরা অনুসরণ করবে বলে আশা করা যায় না।

৩. কিছু অতিরিক্ত সালুন রান্না করা দরকার, যাতে আরো বেশি পরিমাণে লোকদের আপ্যায়ন করা যায়। এছাড়া স্কোয়াশের ন্যায় সব্জি তৈরি করা যেতে পারে; এটা খাবারের পদ বৃদ্ধির একটি মিতব্যয়ী নীতি এবং অধিক সংখ্যক লোককে এভাবে আপ্যায়ন করা যায়।

৪. পিঁয়াজ বা রসুন খেতে হলে রান্না করে খেতে হবে। কাঁচা পিঁয়াজ বা রসুন খেলে মুখ থেকে সৃষ্ট গন্ধ অন্যের জন্য কষ্টদায়ক হয়।

৫. স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাসন কোসন বা ছুরি কাঁটা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৬. দুধ ও মধু হচ্ছে সর্বোত্তম খাদ্য। পশুর সিনার গোশত সর্বোত্তম।

৭. মেঝেতে বসে খাবার খাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া যথাযথ। এটা বিনয়ের প্রতীক।

৮. গরুর গোশতসহ অন্যান্য হালাল গোশত খাওয়াকে নিষিদ্ধ মনে করা অন্যায়।

৯. ইসলামে খাবারের পরিবেশ অন্যান্য সংস্কৃতির চাইতে ভিন্ন। এক্ষেত্রে পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ পরিচ্ছন্নতা, অনাড়ম্বরতা ও মিতব্যয়ীতা; অহেতুক সময় ও প্রচেষ্টার অপচয় করা যাবে না, পাশ্চাত্য রীতিতে যেমনটি হয়ে থাকে, সৌন্দর্যবিধানও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। খাবার গ্রহণকে পুষ্টি বর্ধন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

খেতে বসা

১. খোদার রহমত কামনা করে মুসলমানদের খেতে বসতে হবে। খেতে বসার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন না থাকলেও এর মধ্যে বিনম্রতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২. চিৎ হয়ে বা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় মুসলমানদের খাওয়া যথার্থ নয় এবং দাঁড়িয়ে বা হাঁটার সময় খাবার পরিহার করা উচিত।

৩. খাবার সময় মুসলমানদের যথাযথভাবে বসতে হবে এবং কোন কুশন বা হাতের ওপর ঠেস দিয়ে খাওয়া যথোচিত নয়।

৪. খেতে বসার ব্যবস্থা এমন থাকা চাই, যাতে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ ও সময় ক্ষেপণ না হয়।

৫. খাবার গ্রহণকালে বাম হাতে খাওয়া, গালিগালাজ করা, বৃহৎ পাত্রে অপরের অংশ হতে খাবার খাওয়া প্রভৃতি অসদাচরণকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা উচিত।

খাওয়ার সুষ্ঠু রীতি

১. একা খাবার খাওয়ায় কোন আপত্তি নেই। তবে পরিবারের সকলে একসাথে মিলে খাবার গ্রহণ উত্তম। কারণ পরিবারের সবাই মিলে একটি বৃহৎ পাত্র থেকে খাওয়ার স্বাদই আলাদা।

২. ধনী-গরিব, যুবক-কিশোর-বৃদ্ধ সকলের সাথে আহার করতে ঘৃণা বোধ না করা মনের উদারতার পরিচায়ক।

৩. রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা না থাকলে বা ভীতিকর প্রকৃতির রোগ না হলে শারীরিকভাবে পঙ্গু লোকদেরকে সুস্থ সবল লোকদের সাথে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

৪. খাবার গ্রহণের আগে ও পরে হাত ধুতে হবে।

৫. উত্তপ্ত থাকা অবস্থায় খাবার গ্রহণের জন্য হুমড়ি খাওয়া উচিত নয়। খাবার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। খাবার ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁ দেওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

৬. খাওয়ার শুরুতে মুসলমানদের বলতে হবে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" (আল্লাহর নামে যিনি দয়াময়, করুণাময়) এছাড়া আরো দোয়া পড়া যায়ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা রাজাকতানা ওয়াকিনা আজাবান্নার" (হে খোদা এই খাবারে বরকত দান কর এবং আমাদের দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর)।

৭. খাবার গ্রহণকালে যদি কেউ খোদার নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে বলবেঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরুহু" (খাবারের শুরুতে খোদার নামে এবং সমাপ্তিও তার নামে)।

৮. খাবার গ্রহণকালে কেউ কেউ বিসমিল্লাহ বলল, আবার কেউ বললনা, তা নয়। উপস্থিত সকলকেই তা বলতে হবে।

৯. বৃহৎ পাত্রের সকল দিক থেকে খাবার গ্রহণ করা ঠিক নয়, বরং নিকটবর্তী স্থান থেকেই তা নেয়া দরকার। অবশ্য পাত্রে ফলমূল বা খেজুর থাকলে যে কোন দিক থেকে তা নেয়া যায়।

১০. কোন মুসলমানকে খাবার দেওয়া হলে এবং নামাজের সময় উপস্থিত হলে, প্রথমে তাকে খাবার খেতে হবে এবং খাবার শেষ না করা পর্যন্ত নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করবেনা; অবশ্য যদি এই আশংকা না থাকে যে, খাবার শেষ হওয়ার আগেই নামাজের সময় শেষ হয়ে যাবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ সালাতে তার মনোনিবেশে সহায়তা করা আর খাবার চিন্তা থাকলে এটা সম্ভব নয়।

১১. ডান হাতে চামচ অথবা চামচ না থাকলে ডান হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে খাবার খেতে হবে।

১২. গোগ্রাসে নয়, ধীরে ধীরে খাবার খেতে হবে।

১৩. যদি খাবার পছন্দের না হয়, তাহলে সেজন্য অসন্তোষ প্রকাশ বা সমালোচনা করা যাবেনা। একান্তই সে বলতে পারে, 'আমি খেতে চাইনা' অথবা 'আমি এ ধরনের খাবার বেশি পছন্দ করি না।'

১৪. একই সাথে গরম ও ঠাণ্ডা খাবার গ্রহণ যথার্থ নয়; কারণ এর ফলে দাঁত ও পাকস্থলীর ক্ষতি হতে পারে।

১৫. হালকা আলোচনা হতে পারে, তবে তা বিতর্কিত বিষয় অথবা উসকানিমূলক হবেনা এবং যে কোন মূল্যে অশোভন বর্ণনা এড়িয়ে যেতে হবে; কেননা, এর ফলে অন্যান্যরা বেজার হতে পারে।

১৬. খাবার ভর্তি মুখে কথা বলা অশোভন।

১৭. খাবারকালে মুখ থেকে কিছু খাদ্য পড়ে গেলে, তা সরিয়ে নিতে অথবা সম্ভব হলে খেয়ে ফেলতে হবে। অপচয় করা যাবে না। হাড়ের সাথে অনেক গোশত রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

১৮. খাবার গ্রহণরত লোকদের সম্ভাষণ জানানো যেতে পারে, তবে তাদের সঙ্গে মোসাফা করা যাবে না।

১৯. মুসলমানদের বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। উদর পূর্তির আগেই খাওয়া বন্ধ করা উচিত। গোগ্রাসে খাওয়াটা অনৈসলামি আচরণ।

২০. খাবার পর পরেই ঘুমাতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

২১. খাবার প্লেটে খাদ্য অবশিষ্ট রাখা অনুচিত।

২২. মুসলমানদের খানা শেষ করে বলতে হবে, "আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাজী আত'আমানা, ওয়াসাকানা ওয়াজায়ালনা মিনাল মুসলিমীন।" (সেই খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা, যিনি আমার আহার যুগিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন)। এছাড়া খোদার আরো প্রশংসা করা যেতে পারে একথা বলেঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহে ওয়া আতিমনা খায়রানা মিনহু" (হে খোদা আমাদের বরকত দাও, আমাদের আহার যোগাও এবং উত্তম আহার প্রদান কর)।

২৩. খাবার গ্রহণের পর হাত মুখ ধুতে হবে।* চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের পর হাত মুখ ধোয়া জরুরি। খাবার পর দাঁতের সুরক্ষার জন্য খিলাল ব্যবহার করতে হবে।

২৪. শিষ্টাচারের নিয়ম হচ্ছেঃ পিতামাতার আগে ছেলে মেয়েরা খাবার শুরু করবে না এবং অতিথিদের আগে পরিবারের সদস্যরা খাবার খাবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ইসলামের অন্যতম নীতি।

২৫. খাবার অথবা পানিতে কোন মাছি পড়লে, সেটা না ডুবে যাওয়া পর্যন্ত ঠেসে ধরতে হবে এবং পরে তা বের করে ফেলে দিতে হবে। একটি সহিহ হাদিসে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মাছি তার এক পাখায় রোগ এবং অন্য পাখায় প্রতিষেধক বহন করে।

২৬. প্রত্যেক মুসলমানকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে তার বাড়ির বাইরে যা খাচ্ছে তা হালাল।

২৭. খাবার গ্রহণকালে সংবাদপত্র বা চিঠিপত্র পড়া অনুচিত, এতে খাবার সময় দীর্ঘায়িত হতে পারে।

পানীয়

১. সব রকম উত্তেজক পানীয় নিষিদ্ধ।

২. স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানি পান নিষিদ্ধ। অন্য যে কোন প্রকার পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. পানীয় দ্রব্য বিশেষ করে পানি পরিষ্কার রাখতে হবে এবং বিশেষ করে রাতে পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে।

৪. পানি পানের আগে দেখতে হবে পানিভরা পাত্রটিতে কোন কিছু পড়ে আছে কি-না।

৫. পানি পানকালে ডান হাত ব্যবহার করতে হবে। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া বাম হাত ব্যবহার করবেনা।

---

* এ ব্যাপারে তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে পানি পান করতে হবে।

৭. কোন বোতল, জগ বা চামড়ার পাত্রের মুখ থেকে সরাসরি পানি পান করা উচিত নয়।

৮. ভাঙ্গা কিনারা বিশিষ্ট কোন পাত্র পানি পান করার জন্য ব্যবহার করা উপযুক্ত নয়।

৯. পানি পানকালে পাত্রে নিশ্বাস ফেলা উচিত নয়। এক চুমুকে তৃষ্ণা মেটানো যায় না। মুখ থেকে কাপ সরিয়ে নিয়ে নিশ্বাস ফেলার পর পুনরায় পানি খাওয়া উচিত।

১০. ঝর্ণা, নদী বা জলাশয় থেকে পানি পান করতে হলে পেটের ওপর ভর করে থাকা অবস্থায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করা উচিত নয়। বরং হাত ধুয়ে হাতের সাহায্যে পানি পান করা উচিত।

১১. কাপ অথবা গ্লাস থেকে এক ঢোকে না খেয়ে, ধীরে ধীরে পানি পান করা উচিত। পানি পানকালে মুখ থেকে পাত্র সরিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। পানি পানের সময় তিনভাগে বিভক্ত করে তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এটা অধিকতর তৃষ্ণা নিবারক, স্বাস্থ্যপ্রদ ও উত্তম কাজ।

১২. দাঁড়িয়ে, হেলান দিয়ে অথবা শুয়ে থাকা অবস্থায় পান করা উচিত নয়। বসে থাকা অবস্থায় পান করা উচিত; অবশ্য ঝর্ণা থেকে পানি পান করার সময় বসার প্রশ্ন আসে না।

১৩. পানি পান করার পর মুসলমানদেরকে খোদার প্রশংসা ও শুকরিয়া প্রকাশ করতে হবে। দুধপানের পর দুধের বিশেষ উপকারিতার জন্য আল্লাহর বিশেষ শুকরিয়া প্রকাশ করে বলতে হবে এই বলেঃ "আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফিহে ওয়াজিদনা মিনহু" (হে খোদা, আমাদেরকে দুধ পানের তওফিক দাও এবং তা থেকে সমৃদ্ধি দাও।)।

১৪. একদল লোক যখন পান করে, তখন ডানে অবস্থিত ছেলে-বুড়ো যেই থাকুক, সেই প্রথম পান করবে। প্রথমে পানির পাত্রের চালান ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে। ডানে বসা লোকটিকে অনুরোধ করতে হবে যাতে পানীয়টি ডান দিকের আরেক ব্যক্তিকে চালান দেয়।

১৫. যখন কোন ব্যক্তি একদল লোকের মধ্যে কিছু পানীয় বিতরণ করতে চায়, সে তখন যেন তার ডানে যে কেউ থাকুকনা কেন, তাকেই দেয়। অতঃপর সে ডানদিকেই অগ্রসর হবে যদিও তার বামে কোন বৃদ্ধ লোকও থাকে। ডান দিকে যারা থাকবে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডান হাতে পানীয় চালান দিতে হবে।

১৬. যদি কোন মুসলমানকে কেউ পানীয় পান করতে দেয়, তাহলে তাকে ধন্যবাদ দিতে ভুল করা উচিত নয় এবং তার বরকতের জন্য খোদার কাছে দোয়া করতে হবে।

১৭. যদি কেউ এমন কিছু খায় যাতে চর্বি বা Sugar Acid আছে, যেমন দুধ; তাহলে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরে কুলি করতে হবে।

১৮. যদি কুকুর কোন পাত্র থেকে পানি পান করে, তাহলে মাটি অথবা সাবান দিয়ে ৭ বার পাত্রটি ধুতে হবে। কুকুরের মুখের লালার জন্যই এরূপ করতে হবে। (অন্য প্রাণীর জন্য এটা প্রযোজ্য নয়)।

পঞ্চম অধ্যায়

পোশাক

মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও সামাজিক মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলেও ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তা শুধু 'মাধ্যম' হিসেবেই রয়ে গেছে এবং তা 'লক্ষ্য' নয়। পোশাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিকভাবে মানবদেহ আবৃত করা এবং তাপ বা ঠাণ্ডা থেকে শরীরকে রক্ষা করা।

সমাজের সকল মানুষকে বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হবে– এরকম কোন কথা নেই। বরং একই ধরনের পোশাক পরা ইসলামি শিক্ষার অনুকূল নয়। তবে পোশাকের ব্যাপারে সাধারণ রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এর কতিপয় রূপরেখা নর-নারী উভয়ের জন্য অভিন্ন; বাকীগুলো নারী অথবা পুরুষের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

সাধারণ নীতি

১. অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে মুসলমানদের পোশাকের পার্থক্য থাকা উচিত। পোশাকের বা অন্য কোন ক্ষেত্রে অমুসলমানদের অনুকরণ করা চলবেনা।

২. নর ও নারীর পোশাকের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখতে হবে। কোন পুরুষের নারীর পোশাক পরিধান করা অথবা নারীর পুরুষের পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ।

৩. ঔদ্ধত্য এবং অহংকার প্রকাশ পায়– এমন কাপড় পড়া নিষিদ্ধ। মূলতঃ যে কোন প্রকার ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশের অনুমতি নেই। অবশ্য, চাল-চলনে সৌন্দর্যবোধ ও স্মার্টনেস ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ নয়। চাল-চলনের মাধ্যমে কেউ খোদাকে সন্তুষ্ট করতে চাইলে এবং শুকরিয়া আদায় করতে চাইলে তা মেনে নেয়া যায়।

৪. পুরুষের কমপক্ষে তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা উচিত। আর মহিলাদের হাত ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমগ্র দেহ পোশাকে ঢেকে রাখতে হবে।

৫. নারী ও পুরুষের উল্লিখিত পোশাক স্বচ্ছ (সূক্ষ্ম) কাপড়ের হবে না।

৬. ইউনিফরম নিষিদ্ধ নয়। পেশাদার লোক (সৈনিক, পুলিশ) পেশাগত কারণে পোশাক পরতে পারে। তবে আলেম বা ইসলামি পণ্ডিতদের উচিত নয় বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নিজের আলাদা বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা। 'মোল্লা' বা 'পুরোহিত' সৃষ্টি করার এমন পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না।

৭. নতুন পোশাক পরা জরুরি নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরলেই চলে। কাপড় সব সময় পরিষ্কার রাখত হবে এবং ময়লা পোশাক পরা চলবেনা।

৮. বিশেষ কোন রঙের পোশাক পরা জরুরি নয়। সাদা কাপড় মুসলমানদের আদর্শ পোশাক।

৯. সহজে পরা ও খুলে রাখা যায়, এমন পোশাক উত্তম।

১০. মুসলমানরা যখন নতুন পোশাক কিনবে, তখন এই পোশাক কেনার তওফিক দেয়ার জন্য খোদার শুকরিয়া আদায় করবে।

১১. কাপড় পরিধান শুরু করতে হবে ডান দিক থেকে এবং খুলতে হবে বাম দিক থেকে। উভয়ক্ষেত্রে খোদাকে স্মরণ করতে হবে। তারপর পোশাক ঝুলিয়ে বা ভাজ করে রাখতে হবে।

পুরুষের পোশাক

১. পোশাকের ব্যাপারে উল্লিখিত সাধারণ নীতিমালার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।

২. পুরুষদের জন্য রেশমি, বুটিদার রেশমি, কারুকার্যখচিত রেশমি অথবা চার আঙ্গুলের বেশি রেশমি পাড়ের কাপড় পরা নিষিদ্ধ। তবে পুরুষদের বেলায় স্বাস্থ্যগত বা চিকিৎসাগত কারণে রেশমের কাপড় পরার অনুমতি রয়েছে।

৩. পুরুষদের জাফরান বা হলুদ রং বিশিষ্ট পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য মহিলাদের এসব পোশাক পরার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।

৪. যে ধরনের পোশাক পরা অন্য জাতির অনুকরণের নামান্তর, তা অনৈসিলামিক এবং নিষিদ্ধ।

৫. পুরুষদের পোশাক ঃ

(ক) শার্টের নীচে পরতে হয় গেঞ্জিজাতীয় কাপড় যা প্রধানতঃ সূতা দিয়ে তৈরি।

(খ) শরীরের নিম্নাঙ্গ ঢেকে রাখার জন্য আণ্ডারওয়ার।

(গ) দু'খণ্ড কাপড়ের স্যুট দেহের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য এক খণ্ড পোশাক এবং শরীরের উর্ধ্বাংশ ঢেকে রাখার জন্য আরেক খণ্ড। নিম্নাংশের কোন কাপড় পায়ের গিরার নীচে যাবেনা। গেঞ্জি অথবা উপরের পোশাকের আস্তিন প্রশস্ত হবেনা অথবা কব্জি ছাড়িয়ে যাবেনা। কারণ এ ধরনের জামা পরা হয় অহংকার প্রদর্শনের জন্য।

(ঘ) পাগড়ী অথবা টুপির আকারে মস্তকাবরণী।

৬. ক্রীড়া ও সাঁতারের পোশাক ঃ

পুরুষদের খেলাধুলার পোশাক হবে নগ্নতা ঢেকে রাখার জন্য, সাধারণ নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ– নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা, শরীরের এ অংশ যাতে অন্যের দৃষ্টি গোচর না হয়। সুতরাং খেলাধুলার পোশাক এমন হওয়া উচিত যাতে অতিরঞ্জনের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে অথবা পুরুষের অবয়ব ধরা না পড়ে।

মহিলাদের পোশাক

মহিলাদের পোশাকের সাধারণ রূপরেখা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. মহিলাদের পোশাক একই সঙ্গে বেশ ক'টি শর্তপূরণ করতে হবে, যেমন ঃ

(ক) মুখমণ্ডল ও হাত ব্যতীত সমগ্র শরীর কাপড়ে ঢেকে রাখতে হবে।

(খ) পোশাক এত পাতলা বা স্বচ্ছ হওয়া চলবেনা, যাতে তার শরীর প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

(গ) মূল পোশাকাটি হবে ঝুলন্ত বা প্রলম্বিত। এর অর্থ হচ্ছে নারীদেরকে অবশ্যই 'টাইট' পোশাক পরিহার করতে হবে যাতে তার বক্ষ, পা বা হাত এবং শরীরের আকৃতি বুঝা না যায়।

(ঘ) নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা সংরক্ষণের তাগিদে অমুসলিম নারীদের পোশাক অনুকরণ করতে মানা করা হয়েছে।

(ঙ) নারীসত্তা বজায় রাখতে পুরুষদের পোশাকের অনুকরণ করতে মানা করা হয়েছে।

(চ) যে পোশাক অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা পরিহার করতে বলা হয়েছে।

(ছ) ঘরের বাইরে অথবা অভ্যন্তরে বহিরাগতদের সাথে সাক্ষাৎকালে পোশাকে সুগন্ধি ব্যবহার করতে মানা করা হয়েছে।

২. মুসলিম নারীর পোশাক তিনখণ্ডে বিভক্তঃ কামিজ, নেকাব এবং আলখেল্লা।

(ক) কামিজঃ এটা মাথা, মুখমণ্ডল ও হাত ব্যতীত সারা দেহ ঢেকে রাখার জন্য একটি পোশাক। এটা অবশ্যই লম্বা হতে হবে, যাতে করে মহিলাদের পা পর্যন্ত ঢেকে যায়। এরূপ পোশাক যা সারা শরীর ঢেকে ফেলে। সুতরাং হাঁটু পর্যন্ত তা সীমিত রাখা এবং লম্বা মোজার সাহায্যে পা ঢাকা উচিত নয়। কামিজের আস্তিন প্রশস্ত হবেনা।

(খ) নেকাবঃ এটা একটি মুখাবরণ যা মহিলাদের মাথা ও ঘাড় ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়; এটা সূক্ষ্ম জালের মত হবেনা; তবে যে কোন সামগ্রী দিয়ে তৈরি হতে পারে। তবে এটা স্বচ্ছ সামগ্রী হওয়া উচিত নয়।

(গ) আলখেল্লাঃ এমন একটি পোশাক যা সারাদেহ ঢেকে রাখে এবং মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসে। এর ফলে মহিলাদের মাথা ও কাঁধের আকার গোপন থাকে।

জুতো

১. পুরুষের জন্য তৈরি বা ডিজাইনের জুতো মেয়েদের ব্যবহার করা উচিত নয়। একইভাবে মেয়েদের জুতোও পুরুষদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

২. ক্রেতা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হলে প্রয়োজনানুসারে নতুন জুতো কেনা যেতে পারে। তবে এর জন্য অমিতব্যয়ী হওয়া অথবা এদ্দরুণ অহংকার প্রকাশ করা যাবেনা।

৩. জুতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, অবশ্য এজন্য বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।

৪. ডান পায়ে আগে জুতো পরতে হবে এবং খোলার সময় বাম জুতো আগে খুলতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে।

৫. জুতো পরার সময় পরখ করে দেখতে হবে, রাতে অথবা যেসময় এটা ব্যবহার করা হয়নি, সে সময় এর মধ্যে কোন ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ লুকিয়ে আছে কিনা।

৬. মোজা-জুতো খুলে রাখার সময় তা এমন স্থানে রাখতে হবে যাতে করে উৎকট গন্ধে অন্যরা বিরক্ত না হয়।

স্থাপত্য ও আসবাবপত্র

মুসলামানদের বাসগৃহ

১. বসতবাড়ি হচ্ছে জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এটা অপরিহার্য। এর অর্থ এ নয় যে, মুসলমানরা কারুকার্যময় বিষয়ে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে চমৎকার ভবন নির্মাণে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করবে। বাসগৃহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর বাসিন্দাদের আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় একান্তে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা।

২. শয়নকক্ষ দু'ধরনের হতে হবে– একটি থেকে অন্যটি পৃথক হবে, একটি পিতামাতার জন্য, অন্যটি ছেলেমেয়েদের জন্য। ১০ বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েরা পৃথক পৃথক ভাবে শয়ন করবে।

৩. মুসলিম মহিলারা সাধারণ গোসলখানায় গোসল করতে পারেনা বলে বাড়িতে স্বতন্ত্র গোসলখানা রাখতে হবে।

৪. গোসলখানা থেকে পায়খানা পৃথক হলে ভাল হয়।

আসবাবপত্র

১. মুসলমানদের বাসগৃহে আসবাবপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ অনাড়ম্বর ও অপরিহার্যতা। বিলাসী জীবন যাপন করা হলে তা কার্যতঃ সার্বিকভাবে ব্যক্তি ও জাতির নৈতিকতা ও আচরণের প্রতি মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

২. আসবাবপত্র হবে মধ্যম মূল্যের।

৩. বাহুল্য ব্যয় এড়াতে জানালার আকার অনুসারে পর্দা তৈরি করতে হবে।

৪. গৃহের আসবাবপত্র, টেবিলের সরঞ্জাম অথবা অন্য কোন উপকরণের ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার করা যাবে না।

৫. মুসলমানদের বাসগৃহে প্রাণীজাতীয় কোন মূর্তি রাখা চলবেনা। জীবন্ত প্রাণীর কোন প্রতীক রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ।

৬. বৃক্ষের ন্যায় চেতনাহীন জিনিসের ছবি বা প্রতীক রাখা যেতে পারে।
৭. অমুসমানদের মালিকানায় ছিল বা এখনও আছে, এমন পাত্র ব্যবহার না করার বিকল্প না থাকলে সেগুলো ব্যাপকভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
৮. বাসগৃহে কুকুর রাখা যাবেনা। শুধু প্রহরা অথবা শিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পালন করা অনুচিত। কুকুরকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়।

বসতবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা

১. পরিচ্ছন্ন বসতবাড়ি এবং আনন্দদায়ক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২. খাবারের উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা বাড়ির বাইরে রাখতে হবে যাতে করে বাড়ির বাসিন্দা ও আগত লোকজন দুর্গন্ধে অতিষ্ট না হয়।
৩. বাড়ির প্রাঙ্গণ, প্রবেশ পথ ও বাগানের পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
৪. অনৈসলামিক কুসংস্কারে মুসলমানদের প্রভাবিত হওয় উচিত নয়; যেমন রাতের বেলা বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখায় জ্বীনদের অসুবিধা হয় বা গরিব হতে হয় অথবা বাড়ির কোন এক ব্যক্তি সফরে রওনা হয়ার পর বাড়ি পরিষ্কার রাখলে ঐ ব্যক্তির ক্ষতি হয়– ইত্যাদি।

অলংকার ও সৌন্দর্য

ইসলামি আদবের সাধারণ নীতিমালা তথা সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার নীতি, ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ীতা প্রভৃতি অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ফলে মুসলমানদের বাসগৃহের বৈশিষ্ট্য হবে পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, অনাড়ম্বর, রুচিশীল পরিবেশ ও শালীনতাবোধসম্পন্ন।

বাড়িতে নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

ঘুমাবার আগে ইসলাম নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের পরামর্শ দেয় ঃ
১. সমস্ত দরজা বন্ধ করা হয়েছে।
২. খাবার পাত্র ও পানির পাত্রগুলো ঢাকা হয়েছে।
৩. আগুনের সবরকম উৎস যেমন গ্যাস, কুকার নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক আচরণ

ইসলামে পরিবার সমাজের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত ও গৌরবমণ্ডিত। পারিবারিক সম্পর্ক সুস্থ ও সামঞ্জস্যশীল রাখার প্রতি এজন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্ক নিরূপণকারী আচরণবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্ত্রীর প্রতি আচরণ

১. ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি স্ত্রীর কাছে উত্তম ও সহানুভূতিশীল– সে-ই উত্তম মানুষ। স্ত্রীর প্রতি সদাচারণ হচ্ছে ইসলামি নীতির বহিঃপ্রকাশ।

২. মানুষের জীবন কখনই এমন একতরফাভাবে পরিচালনা করা উচিত নয়, যাতে তার বৈবাহিক জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে। পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে যেরকম সময় ব্যয় করা হোকনা কেন, স্বামীর সময়ের প্রতিও তার হক রয়েছে। স্ত্রীর সাথে হাস্যকৌতুক, সঙ্গদান, খেলাধুলা করা এবং ইসলাম অনুমোদিত বিধানের আওতায় সময় ব্যয় করা যেতে পারে।

৩. ইসলাম বিরোধী না হলে স্ত্রীর সকল প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের ভরণপোষণ করাই অর্থব্যয়ের উত্তম পথ।

৪. মহিলাদের জন্য নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মসজিদের চাইতে বাসগৃহ উত্তম হলেও তারা মসজিদে যেতে চাইলে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না।

৫. একান্ত বিষয় বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে অন্যদের সাথে কথা বলা পুঁরোপুরি অন্যায়।

৬. স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামী ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে। ভিত্তিহীন সন্দেহ অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ঈর্ষাপরায়ণতা পরিহার করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণে ঈর্ষা করার কিছু থাকলে তা করা যায়।

৭. স্ত্রীর এক ধরনের আচরণ স্বামী অপছন্দ করলেও অন্য ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে– এজন্য স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা করবেনা। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় অথচ স্বামী পছন্দ করেনা, স্ত্রীর এমন চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। স্ত্রীর রয়েছে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, যা তার স্বামী থেকে পৃথক এবং স্ত্রীর এই ব্যক্তি- স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে দেয়া বা স্বামীর মত সামঞ্জস্যশীল করে তোলার অধিকার নেই। স্বামীকে স্মরণ রাখতে হবে স্ত্রীর চরিত্রের কতিপয় দিক অপ্রিয় মনে হলেও তার নিজের চরিত্রের কতিপয় দিকও স্ত্রীর কাছে অপ্রিয় হতে পারে।

৮. স্বামী কখনও তার স্ত্রী অথবা তার আত্মীয় স্বজনকে গালিগালাজ করবে না।

৯. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে বিশেষ প্রকৃতির। লজ্জা ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে সৃষ্ট কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা না করলে এই সম্পর্ক গাঢ় হবেনা।

১০. পরিবার পরিচালনার ব্যাপারে স্বামীকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তার অপব্যবহার ও বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সুতরাং স্ত্রীর কাছে এমন কিছু চাওয়া ঠিক নয় যা তার সামর্থ্যের বাইরে। তাকে খুব বেশি আদেশ করাও ঠিক নয়।

১১. স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জোরদার হয়।

১২. স্ত্রীর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অতিথিপরায়ণ হওয়া স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই নামান্তর।

১৩. দ্বাদশ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাবিননামার অধিকাংশ শর্ত পূরণ করতে হবে। সুতরাং বিয়ের পর এসব শর্ত বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে, অবহেলা বা ভুলে গেলে চলবেনা। অবশ্য এ সব শর্ত ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী হতে হবে।

১৪. কথায় কথায় স্ত্রীর ভুল ধরা, তার কাজকর্ম অপছন্দ করা, তার নিন্দা করা বিবাহকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। স্বামীকে বহুক্ষেত্রে স্ত্রীর ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১৫. স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী অথবা সন্তানদের প্রতি ইসলামি বিধান লংঘন করে,

উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করে, তাহলে তা হবে এক চরম ভুল যা কোন মুসলমানের করা উচিত নয়।

১৬. অন্য লোকদের বিশেষ করে আত্মীয়, সন্তানদের সামনে স্ত্রীর নিন্দা বা তার কাজ অগ্রাহ্য করা নিঃসন্দেহে একরূঢ় আচরণ।

১৭. স্ত্রীকে অর্থ উপার্জনের কথা বলার জন্য স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার ভরন পোষণের দায়িত্ব খোদ স্বামীর।

১৮. বাসায় ফেরার পর স্বামী বেল বাজিয়ে অথবা দরজায় কড়া নেড়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা না করে বাসায় ঢুকবেনা। আলহামদুলিল্লাহ বলে বাড়িতে ঢুকে দু'রাকাত নামাজ পড়বে। এরপর সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে।

১৯. স্বামীকে তার মুখের গন্ধ সুঘ্রাণ রাখতে হবে যাতে তার স্ত্রী ব্যথিত না হয় অথবা রাগ না করে।

২০. স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক হবে কঠোরতা ব্যতীত দৃঢ়তা এবং দুর্বলতা ব্যতীত নমনীয়তার ভারসাম্যের মাধ্যমে।

মুসলিম স্ত্রীর সঠিক আচরণ

১. সৎ স্ত্রী এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তম স্ত্রীকে বিশ্বের সর্বোত্তম উপহার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. বিবাহে স্ত্রীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুত তাই-ই হচ্ছে চূড়ান্ত বিষয়।

৩. স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য স্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টা করা কর্তব্য।

৪. আদর্শ স্ত্রীর তিনগুণ রয়েছে ঃ স্বামী তাকে দেখে যাতে খুশি হয় সেজন্য সেজেগুজে হাজির হয়, আদেশ করলে সে মান্য করে, সে স্বামীর সম্পত্তির ব্যাপারে তার ইচ্ছার বিরোধী কাজ করে না।

৫. স্বামী যখন তাকে বিছানায় ডাকে তখন সাড়া না দেয়া একটি অপরাধ যা স্ত্রীর অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

৬. নফল রোজা রাখতে চাইলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে স্ত্রীর রোজা রাখতে হবে। স্বামীর অনুমতি না পেলে রোজা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এর কারণ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীর সাতে সঙ্গম করতে চাইলে রোজা রাখা অবস্থায় তা সম্ভব নয়।

৭. স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামী যাকে চায়না স্বামীর অনুমতি ছাড়া তাকে বাসগৃহে ঢোকার সুযোগ না দেওয়া।

৮. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পত্তি থেকে স্ত্রী কাউকে কিছু দিতে পারেনা।

৯. স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী অতিরিক্ত অর্থ চাইবেনা অথবা এমন জিনিস চাইবেনা যা তার সামনে নেই এবং সে দিতে পারেনা তাকে যা-ই দেওয়া হোকনা কেনো সেজন্য সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

১০. স্বামী বাড়িতে কোনপ্রকার সহযোগিতা করতে চাইলে স্ত্রীর কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করা উচিত।

১১. স্বামী কোন বিষয়ে শপথ করালে তার প্রতি অনুগত থাকা উত্তম স্ত্রীর কর্তব্য।

১২. স্বামী বাসগৃহে ফিরলে স্ত্রী তাকে সহাস্যে স্বাগত জানাবে এবং রুচিশীল অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে।

১৩. স্ত্রী কখনও তার স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি অবহেলা বা তার চাহিদার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখাবেনা। স্ত্রী স্বামীর যতই পরিচর্যা করবে তার প্রতি স্বামীর ভালবাসা ততই বেড়ে যাবে। অধিকাংশ স্বামী তাদের প্রতি স্ত্রীর যত্ন নেয়াকে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

১৪. স্বামী বাড়িতে ফিরলে পারিবারিক সমস্যা অথবা ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন না করার ব্যাপারে স্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে। এর পরিবর্তে দীর্ঘ ও পরিশ্রান্ত দিনের শেষে স্ত্রীর উচিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৫. পারিবারিক সমস্যা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে হবে স্ত্রীকে।

১৬. স্বামীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করা মূলতঃ স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শামিল।

১৭. বেশি বেশি করে বাড়ির বাইরে যাওয়া নারীদের বদঅভ্যাস বটে। স্বামী আপত্তি করলে স্ত্রী বাড়ির বাইরে যাবে না।

১৮. স্বামীর আপত্তির মুখে আগন্তুকদের সাথে স্ত্রী কথা বলবে না।

১৯. স্বামীর কথা স্ত্রীকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে

২০. স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সম্পদ থেকে কাউকে ধার দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর নেই। তবে সে নিজস্ব সম্পদ থেকে ধার দিতে পারে।

২১. উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া নিষেধ।

২২. স্বামীর বন্ধু তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিলে স্ত্রী তার জবাব দেবে, তবে দীর্ঘ কথোপকথনে যাবে না।

২৩. স্বামীর সাথে বাদানুবাদ করা, তার প্রতি গালমন্দ করা, বিতৃষ্ণায় রূপ নেয় এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

২৪. বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ এবং গার্হস্থ্যালি কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে স্ত্রীর দায়িত্ব। সুতরাং বাড়িঘর, আসবাবপত্র সংরক্ষণ করে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তাকে মিতব্যয়ী হতে হবে।

২৫. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে স্ত্রী কাউকে সাহায্য করবেনা বা ভিক্ষা দেয়াও অনুচিত।

২৬. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্কের কথা অন্যদের বলা ইসলামে মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত।

২৭. স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ প্রকাশে ভীতু হবেনা। এর ফলে সে সন্তুষ্ট হবে এবং পরিবারের প্রতি বেশি করে টানবে। যদি স্বামী বাড়িতে আকর্ষণীয়া, প্রেমময়ী স্ত্রী দেখতে না পায়, তাহলে সে ঘরের বাইরে অন্যত্র ভালবাসার জন্য ছুটবে।

২৮. পরিবারের নেতৃত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত। স্ত্রী স্বামীর সমান পরিমাণ কর্তৃত্ব দাবি করলে, তা হবে পরিবারের দুই কর্তার জঙ্গি অবস্থান এবং ইসলামে এর স্থান নেই। তবে স্বামীর স্বৈরাচারী কায়দা ব্যবহার করা এবং তার অবস্থানের অপব্যবহার করা নীচতার পরিচায়ক। প্রেম প্রীতি ভালবাসা দেখাতে হবে স্ত্রীর প্রতি এবং জীবন সঙ্গী হিসেবে আচরণ করতে হবে।

সন্তানদের প্রতি পিতামাতার আচরণ

১. শিশুরা প্রত্যেক মানুষের জীবনের হাসি, আনন্দ ও গৌরবের উৎস। সুতরাং পিতামাতাকে অত্যধিক আস্থা, মিথ্যা গৌরব প্রচারে লিপ্ত হওয়া যাবেনা

এবং তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে শিশুরা যাতে অপকর্মে লিপ্ত হতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

২. শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠনে পিতামাতার প্রতি তাদের নির্ভরশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. ইসলামে শিশুদের তিনটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার হচ্ছেঃ বেঁচে থাকার অধিকার, সমপর্যায়ে বাঁচার অধিকার ও বৈধতার অধিকার, যার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক শিশুর বৈধ পিতা থাকবে, সঠিক লালন পালন এবং সাধারণ পরিচর্যার অধিকার থাকবে।

৪. শিশুদের কল্যাণের ব্যাপারে দায়িত্ব ও আগ্রহ হচ্ছে পিতামাতার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

৫. ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, শিশুর বয়স সাত দিন হলে (ক) শিশুর একটি সুন্দর আকর্ষণীয় নাম রাখতে হবে। (খ) তার মাথা নেড়ে করে দিতে হবে (গ) মেয়ের জন্য ১টি ভেড়া বা ছাগল এবং ছেলের জন্য ২টি ভেড়া বা ছাগল জবাই করে তার গোশত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।[১] এই অনুষ্ঠানকে আকিকা বলে।

৬. পিতা তার সন্তানদের সুশিক্ষার চেয়ে উত্তম কিছু দিতে পারেন না। তিনি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে শিক্ষা দেবেন, তা হচ্ছে ইসলামি শিক্ষা বিশেষ করে কুরআন ও সুন্নাহার শিক্ষা।

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম মাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি তার ছোট ছোট শিশুদের প্রতি স্নেহশীল।

৮. কন্যা সন্তানের ওপর ছেলেদের অথবা ছেলেদের ওপর মেয়েদের প্রধান্য দেওয়া কখনই উচিত নয়। তবে ইসলাম মেয়েদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়ার, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

---

১. সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের জন্য ১ ভাগ ও ছেলেদের জন্য ২ ভাগে বরাদ্দ রয়েছে।

৯. ছেলেমেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের বিয়ে শাদির ব্যাপারে সম্ভব হলে সহায়তা করতে হবে।*

১০. ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া উত্তম গুণ। কার্যতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুদের প্রতি দয়াদ্র হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের খ্যাতি রয়েছে।

১১. পিতামাতা জীবিত অথবা মৃত, হাজির অথবা গরহাজির, পরিচিত অথবা অপরিচিত যাই হোক না কেন, শিশুদেরকে আত্মীয়-স্বজন এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পরিচর্যা করতে হবে।

১২. সকল সন্তানের প্রতি সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৩. শিশুদের আলিঙ্গন করে অথবা চুমো খেয়ে আদর করা উত্তম আচরণ।

১৪. শিশুদের লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে অবশ্যই অতি রক্ষণশীল বা অতি উদার হওয়া অনুচিত।

১৫. পিতামাতাকে শিশুদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার কথা বলতে হবে এবং তাদের ওপর বেশি বোঝা চাপানো চলবেনা। পিতামাতার কর্তৃত্বের অপব্যবহার করা অনুচিত।

১৬. ক্ষুদ্র হলেও ছেলেমেয়েদের উপহার পিতামাতার গ্রহণ করা উচিত।

১৭. ইসলামি শিক্ষা মোতাবেক শিশুদের লালন পালন করা অত্যন্ত জরুরি। শৈশব থেকে ধর্মীয় জীবনে প্রশিক্ষণ দান প্রয়োজন। সাত বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েরা যাতে নামাজ পড়ে পিতামাতাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. ইসলামের বিভিন্ন দিক ও ইসলামি আদব সম্পর্কে শিক্ষাদান পিতামাতার অন্যতম কর্তব্য।

১৯. পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েদের আনুগত্য অনেকখানি পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল। তাদের কাছে বেশি কিছু দাবি করা তাদেরকে বেয়াদবির দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।

---

* স্মরণ রাখতে হবে লেখক জর্দানি এবং স্বাভাবিকভাবেই সেদেশের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের দেশে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা পিতামাতাই করে থাকে এবং তা ইসলামি সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিকও নয়– অনুবাদক।

২০. দশ বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের পৃথক বিছানায় থাকতে হবে।

২১. মাতা, বোন বা কন্যার পক্ষে (ক) হাত ও মুখমণ্ডল (খ) ঘাড় ও কলার এলাকা (গ) বাহুর উর্ধ্বাঙ্গ থেকে আঙ্গুলের প্রান্ত এবং (ঘ) পায়ের নিম্নাংশ ছাড়া সাবালক পুত্র, ভাই বা পিতার সামনে শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচরণ

পিতামাতার সঙ্গে ছেলেমেয়ে বিশেষতঃ সাবালক ছেলেমেয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ

১. পিতামাতা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কের দরুণ পিতামাতার প্রতি সন্তানদের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পিতামাতার চাইতে সন্তানদের সহৃদয়তা, ধৈর্য ও উত্তম আচরণের হকদার আর কেউ হতে পারেনা।

২. অন্য কারো চাইতে সন্তানদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বেয়াদবি বা অসৌজন্যমূলক কার্যক্রমের ব্যাপারে পিতামাতা অত্যন্ত বেশি স্পর্শকাতর হন। এজন্য পিতামাতার সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের খুবই সুবিবেচক হতে হবে।

৩. পিতামাতা সাধারণতঃ মনে করেন যে, তারা অনেক অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও সঠিক; হয়তো এটা তাদের ভুলও হতে পারে। শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরেও পিতামাতার এ ধারণা থাকে যে, তারা ছেলেমেয়ের অভিভাবক। অত্যন্ত সহমর্মিতা ও ছবরের সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবেলা করতে হবে।

৪. যদিও পিতামাতা উভয়েই ছেলেমেয়েদের সহৃদয় ব্যবহারের হকদার, তথাপি এক্ষেত্রে বেশি হকদার হচ্ছে তার মা, তারপর পিতা। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'বেহেশত মায়ের পদতলে'।*

৫. পিতার নাম ধরে ডাকা সন্তানদের জন্য অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক কাজ।

৬. পিতার বন্ধুদের প্রতি সদয় আচরণ এবং তার মৃত্যুর পরেও তার বন্ধুর প্রতি সৌজন্য দেখানো অত্যন্ত উত্তম কাজ।

৭. ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য দায়ী। প্রয়োজন

---

* আল হাদিস।

হলে পিতামাতার ভরণপোষণ এবং তাদের জীবন আরামদায়ক করা ধর্মীয় দায়িত্ব।

৮. পিতামাতাকে বিরক্ত করতে পারে এমন বিষয় এড়িয়ে যেতে হবে। পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়ের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্য ও সমবেদনা। এমনকি পিতামাতা ছেলেমেয়ের কাছে যদি এমন কিছু দাবি করে, যা তার আয়ত্তের বাইরে, তাহলে ইচ্ছা পূরণে অপারগতার জন্য তার বিনীতভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

৯. পিতামাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক কারো বিনিময়ে হতে পারেনা। অথবা একজনকে অপরজনের বিনিময়ে ত্যাগ করা যায়না। এক্ষেত্রে সমঝোতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ রচনা করতে হবে।

১০. পিতামাতার সাথে কথা বলার সময় ছেলেকে বিনীত ও ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে।

১১. পিতামাতার প্রতি আনুগত্যের দরুণ যদি কোন ব্যক্তিকে খোদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়, তাহলে খোদার পক্ষেই তাকে কাজ করতে হবে। এটা সত্য যে, পিতামাতা তাদের সন্তানের কাছ থেকে আনুগত্যের প্রতাশী হবেন; কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড যদি খোদার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে পার্থক্য রেখা টানতে হবে এবং তা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বিনীত ও ভদ্রভাবে তাদের আদেশ বাস্তবায়নে অসম্মতি জানানো অপরিহার্য।

১২. পিতামাতা মূর্তিপূজক এবং ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণার পোষক হলেও তাদের প্রতি ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সমবেদনা, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও স্নেহশীল হওয়া প্রয়োজন।

১৩. পিতামাতাকে আন্তরিক পরামর্শদান করা প্রয়োজন।

১৪. পিতামাতা সন্তানকে কোন কিছু বলতে চাইলে তা আগ্রহের সাথে শুনতে হবে। কথা বলার সময় তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয় এবং তাদের সাথে বাদানুবাদ করা অনুচিত।

১৫. গৃহের বাইরে পিতামাতার সাথে বেড়াতে গেলে সন্তান তাদের আগে হাঁটবেনা এবং তাদের আগে কোন আসনে বসবেনা।

১৬. পিতামাতার ক্ষতির কারণ হওয়া উচিত নয়।

১৭. পিতার নিকট অর্থ নাই অথবা তিনি সহজে দিতে পারবেন না– এ ধরনের অতিরিক্ত অর্থ না চাওয়ারই অভ্যাস করতে হবে।

১৮. পিতামাতার ভরণপোষণ বাবদ অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানের উদারতা জাহির করা নিষিদ্ধ।

১৯. সন্তানের অবস্থান যাই হোক না কেন ঘরে এবং বাইরে পিতামাতার অনুগত হওয়া ও তাদের সেবা করা সম্মানের কাজ।

২০. পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদেরকে নিজের বাড়িতে রেখে পরিচর্যা করা সন্তানের কর্তব্য। পিতামাতার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদেরকে বৃদ্ধ নিবাসে প্রেরণ শুধু অসৌজন্যই নয় বরং আপত্তিকর।

২১. অপরের সঙ্গে হাসিমুখে দেখা করা যদি সহৃদয়তার কাজ হয়, তাহলে পিতামাতার সাথে এরূপ করা অপরিহার্য।

২২. পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতে সন্তানকেই উদ্যোগী হয়ে সম্ভাষণ জানাতে হবে। পিতামাতা তাকে সম্ভাষণ জানাবেন সন্তানের এরূপ আশা করা উচিত নয়।

২৩. পিতামাতা সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করলেও সন্তানের উচিত তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সদ্ব্যবহার করা।

২৪. পিতামাতাকে গালি-গালাজ করা মারাত্মক গুণাহ। কোন সন্তানের উচিত নয় অন্যের পিতামাতাকে গালিগালাজ করা; কারণ তাহলে তারাও তার বাপ-মাকে গালি দেবে।

২৫. পিতামাতার সঙ্গে পুত্রের যতই মতভেদ হোকনা কেন সে তাদেরকে বাঁকা কথা বলবেনা অথবা এমন ভাব দেখাবেনা যাতে তারা ব্যথিত হয়।

২৬. সৎ মাতাও পুত্রের অন্যতম আত্মীয়। সুতরাং তার প্রতি পুত্রের অবহেলা করা চলবেনা।

২৭. পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি কর্তব্য শেষ হয়ে যায়না; তাদের জন্য দোয়া করা, রুহের মাগফেরাত কামনা করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও অন্যতম কর্তব্য।

২৮. বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা শারীরিকভাবে দুর্বল ও মানসিকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এর ফলে তাদের মধ্যে অধৈর্য, কর্মক্ষমতায় শৈথিল্য, রুক্ষ মেজাজ এবং সম্ভবতঃ তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েন। সুতরাং পুত্র-সন্তানকে এসব বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে এবং বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি সহনশীল হতে হবে।

২৯. সন্তানদের কর্তব্য হচ্ছে কোন প্রকার আদেশ নিষেধ ছাড়াই পিতামাতার গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করা।

৩০. পিতামাতার প্রতি অবহেলা, অবাধ্যতা, কঠোর আচরণ করা পাপ। সারা জীবনের সব রকম ভুলের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা যেতে পারে; কিন্তু পিতামাতা কর্তৃক কৃত ভুলের ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত

১. যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ মুসলমান। কুরআন তেলাওয়াত এবং তার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন দুটি প্রধান গুণ।

২. পবিত্র কুরআন ডান হাতে ধারণ এবং দেয়া-নেয়ার সময় ডান হাতে নিতে হবে, বাম হাতে নয়।

৩. সন্তান প্রসবের পর অথবা মাসিকের সময় মহিলারা এবং যে নারী-পুরুষের ওপর গোসল ফরজ তাদের কুরআন স্পর্শ করা বা পড়া উচিত নয়।*

৪. কুরআনের সকল অধ্যায় এবং সকল শব্দ কল্যাণকর ও উপকারী।

৫. দলবদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াত করা প্রয়োজন।

৬. কুরআন তিলাওয়াত বা অধ্যয়নের সময় মনোযোগের সঙ্গে শুনা শুধু শিষ্টাচার নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

৭. যথাযথ ধ্যান ও চিন্তাচেতনার সঙ্গে কুরআন অধ্যয়ন এবং অর্থ অনুধাবনের জন্য মনোযোগ অপরিহার্য।

৮. কুরআন একটি হেদায়াত গ্রন্থ। পবিত্র কুরআনে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক এবং অন্যান্য বিষয় থাকলেও তা ইতিহাস, বিজ্ঞান বা ভূগোল গ্রন্থ নয়।

৯. মানবজাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য কুরআন হেদায়াত গ্রন্থ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং শুধু এ ধরনের অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত যথেষ্ঠ নয়।

১০. কুরআন ক্রয় বা বিক্রয়কালে কোন নির্ধারিত মূল্য লেখা না থাকলে আনুমানিক মূল্য দিয়ে দেয়া উত্তম, দর কষাকষি করা অনুচিত।

---

* অধিকাংশ বিদগ্ধ আলেমের মতে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া যায়। ছোঁয়া যায় না– অনুবাদক।

১১. বারবার কুরআন পড়ে জ্ঞানকে তাজা করা উচিত; যারা হাফেজ বা যারা কুরআন বা সূরা মুখস্থ রাখতে চায়, তাদের জন্য এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিছুদিন এই অভ্যাস না থাকলে তা স্মরণে রাখা যায় না।

১২. কুরআন অধ্যয়ন বা তিলাওয়াতকালে তাজবিদের অন্তর্ভুক্ত প্রচলিত উচ্চারণ ও স্বরভেদ নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। মহানবী (সা.) ও সাহাবীদের সময় থেকে এসব বিধি চালু হয়ে আসছে।

১৩. কুরআন তিলাওয়াতের সময় সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে হবে, গান গাওয়ার সুরে নয়; কারণ সুললিত কণ্ঠের আওয়াজ কুরআনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। তবে তা তাজবিদের বিধির বিরোধী হবেনা। কেউ কেউ কুরআন পাঠকালে সুরেলা কণ্ঠে গানের মত করে পাঠ করেন, যা তাজবিদের বিধির বিরোধী এবং এটা নিষিদ্ধ। এধরনের তিলাওয়াতের সময় শ্রোতাকে প্রথম সুযোগেই তিলাওয়াত শুদ্ধ করে দিতে হবে এবং এই ভুলের ব্যাপারে বিনীতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

১৪. কুরআনের ১৪টি সিজদার আয়াত সম্বলিত যেকোন আয়াত পড়ার সময় কুরআন শরীফ একপাশে রেখে সিজদাহ্ করতে হবে।

১৫. অন্যের কুরআন তিলাওয়াতের সময় ভুল ধরার ব্যাপারে কর্কশভাব দেখানো উচিত নয়।

১৬. আল-কুরআন আসমানি কিতাব বিধায় কুরআন সম্পর্কে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

মসজিদ

মসজিদ এমন এক স্থান যেখানে মুসলমানরা প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায় করে; যেখানে তারা এই বিশ্বের জ্বালা যন্ত্রণা, তার চিরন্তন ও দৈনন্দিন চাহিদা, জটিলতা এবং আত্মশ্লাঘা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

মসজিদের ডিজাইন

১. প্রত্যেক আবাসিক এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে হবে।

২. মসজিদের ডিজাইন হবে অনাড়ম্বর এবং আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম হবে তদনুরূপ।

৩. মসজিদে জাঁকজমকপূর্ণ কারুকার্য থাকা উচিত নয়; ছবি বা মূর্তি বা অন্য কিছুর প্রতীক থাকবেনা।

৪. বিলাসবহুল মসজিদ নির্মাণ করে বিপুল অর্থের অপব্যয় করা চলবে না।

৫. মুসলিম সমাজের সদস্যদের উচিত নয় বিশেষ কোন মসজিদের বরকত বা সৌন্দর্য নিয়ে তর্কবিতর্ক করা অথবা জাকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

৬. মসজিদের কোন অংশে বা সাজসজ্জায় স্বর্ণ-রৌপ্যের অংশবিশেষ লাগানো নিষিদ্ধ।

৭. মসজিদের দেয়াল ও কার্পেট বহু বর্ণ রঞ্জিত হওয়া উচিত নয়, কারণ এর ফলে নামাজদের মনোযোগ বিঘ্নিত হয়।

৮. মসজিদের দেয়ালের ভেতরে বা বাইরে কুরআনের আয়াত বা খোদার গুণাগুণের বর্ণনা সমেত লেখা পরিহার করতে হবে। একইভাবে মহানবীর (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত চার খলিফার নামও লেখা উচিত নয়।

৯. মসজিদের মাঝখানে মিম্বর স্থাপন করা উচিত নয়। তিন ধাপের বেশি এর উঁচ্চতা হবেনা।*

---

* আমাদের দেশে হানাফি মাজহাব অনুসারে মসজিদের মাঝখানেই মিম্বর স্থাপন করা হয়। বলতে গেলে, সমগ্র উপমহাদেশেই এই রীতি প্রচলিত– অনুবাদক।

১০. প্রত্যেক মসজিদে ২টি প্রবেশপথ থাকবে– ১টি পুরুষদের, অন্যটি থাকবে মহিলাদের জন্যে।

১১. পায়খানা, পেশাবখানা– মসজিদ এবং অজুখানা থেকে যতদূরে রাখা যায়, ততই ভাল।

১২. মসজিদের অভ্যন্তরে পতাকা ওড়ানো উচিত নয়.।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

মসজিদ হবে পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতম স্থানের অন্যতম। সেজন্যে ঃ

১. মসজিদে প্রবেশের আগে মুসলমানদের নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের দেহ ও পোশাক পরিচ্ছন্ন এবং তাতে দুর্গন্ধ নেই।

২. জুতোর ময়লা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং মসজিদে প্রবেশের আগে জুতো খুলে নিতে হবে।

৩. মসজিদে পানহার নিষিদ্ধ না হলেও; সেটা খাওয়া দাওয়ার স্থান নয়।

৪. মসজিদে কেউ ময়লা নিয়ে আসলে অথবা কেউ ময়লা সৃষ্টির কারণ হলে তার উচিত তা পরিষ্কার করা। খাদেমদের কর্তব্য নয় শুধু মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা, মসজিদে প্রবেশকারী প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মসজিদে কোন প্রকার ময়লা থাকলে তা পরিচ্ছন্ন রাখা।

৫. সুগন্ধির পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদে গোলাপজল স্প্রে করা যায়।

জুমাবারে করণীয়

১. শুক্রবার ইসলামের দৃষ্টিতে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হলেও সেটা ইহুদিদের মত ইসলামি সাবাথ নয়; কারণ ইসলামে সাবাথ-এর অস্তিত্ব নেই।*

২. জুমার নামাজে যাবার আগে মুসলমানদের অবশ্যই যতদূর সম্ভব অজু সহকারে গোসল করতে হবে। ফরজ না হলেও গোসল করা মুস্তাহাব এবং এর একটি পরিচ্ছন্ন দিকও রয়েছে। অজু উত্তম হলেও গোসল করা চমৎকার।

৩. এইদিন সম্ভব হলে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান ও প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া সুগন্ধি কেশ তৈলও ব্যবহার করা যায়।

৪. দাঁত পরিষ্কার এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ব্রাশ বা মিসওয়াক ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবার জুম্মার নামাজে রওনা হওয়ার আগেই এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন।

৫. নামাজে রওনা হবার আগে হাত-পায়ের নখ কাটতে হবে এবং পোশাকাদি পরিচ্ছন্ন ও দাঁড়ি-গোফ সুবিন্যস্ত রয়েছে কিনা– সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৬. শিশু-নারী-বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং পীড়িত ছাড়া শুক্রবার জুমার নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

৭. একাধিক মসজিদ থাকলেও শুক্রবার জুমার নামাজ একটি মসজিদে একত্রে পড়া উত্তম।

৮. শুক্রবার মসজিদে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি যাবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সম্ভব হলে গাড়িতে না চড়ে মসজিদে হেঁটে যাওয়াই শ্রেয়।

---

* সাবাথ (Sabbath)t ইহুদিদের শনিবারের বিশ্রাম ও প্রার্থনা দিবস। এদিন তাদের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা তা অমান্য করায় তাদের প্রতি গজব নাজিল হয়– অনুবাদক।

৯. মসজিদে প্রবেশের পর ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আচরণবিধি অবশ্যই মেনে চলা আবশ্যক।

১০. মসজিদে বিরক্তিকর কিছু না করাই উত্তম। যেমন দু'জনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো অথবা কাউকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

১১. জুমার দিন অধিকাংশ মসজিদ নামাজিদের দ্বারা ঠাসা থাকে। কাউকে উঠিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বসার কারো অধিকার নেই। সামনে যাওয়ার জন্য নামাজিদের বিনীতভাবে অনুরোধ করতে হবে।

১২. মসজিদে থাকাকালে মুসুল্লিদের এমনভাবে বসা চলবেনা যাতে তার ঝিমুনী আসে, ঘুম ধরে, যার ফলে তার অজু নষ্ট হয়ে যায়।

১৩. কোন মুসুল্লি যদি নিজেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন বলে দেখতে পায়, তাহলে তার স্থান ত্যাগের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে সে তার পার্শ্ববর্তী লোকের সাথে স্থান পরিবর্তন করবে।

১৪. কোন মুসুল্লী এমনভাবে বসবেনা, যাতে করে তার নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী শরীরের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ে।

১৫. মহানবী (সা.) শুক্রবার জুমার নামাজের আগে মুসল্লিদের মসজিদে চক্রাকারে বসতে নিষেধ করেছেন; কারণ এর ফলে লাইন সোজা করা যায়না এবং স্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১৬. মিম্বর থেকে খুতবা দানের সময় ইমামের সামনাসামনি বসা উচিত।

১৭. খোদার রহমত কামনায় সানুনয় ভঙ্গিতে হাত উপরে উঠানো ইমামের উচিত নয়।

১৮. জুমার নামাজ শেষ হলে মসজিদ ত্যাগ করার জন্য নামাজিদের তাড়াহুড়া করা বা দরজায় ভীড় জমানো বাঞ্ছনীয় নয়।

১৯. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামে সাবাথ-এর কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং শুক্রবার সারাদিন কাজ বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নামাজের সময় কাজ বন্ধ রাখা।

২০. খুতবা শুরুর পর থেকেই মুসুল্লিদের ইমামের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতে হবে। জুমার নামাজে

হালকা মেজাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হওয়া নামাজের লক্ষ্যের পরিপন্থী।

২১. শুধু শুক্রবার রোজা রাখা উচিত নয়। তবে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার সহযোগে শুক্রবার রোজা রাখা যেতে পারে।

২২. শুক্রবার সফর বাতিল করার কোন প্রয়োজন নেই বা করা উচিত নয়।

২৩. শুক্রবার মহানবী (সা.)কে স্মরণ করার উত্তম সময় এবং "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ" (হে আল্লাহ, মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ও তাঁর পরিবারের প্রতি তুমি রহম করো) বলে (অর্থাৎ দরুদ শরীফ পাঠ করে) তাঁর রুহের প্রতি সওয়াব পৌছানো উচিত।

২৪. প্রতি শুক্রবার কুরআনের সূরাহ 'কাহফ' পাঠ করা প্রয়োজন।

শুক্রবারের জুমার খুতবা

১. শুক্রবার সবসময় কালো কাপড় পড়ার রেওয়াজ ইমামকে পরিহার করতে হবে।

২. মিম্বরে আরোহণ করার পূর্বে বা পরপরই ইমামকে নামাজিদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতে হবে।

৩. খুতবা দানের সময় ইমামকে নামাজিদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

৪. খুতবার আলোচ্য বিষয় প্রাসঙ্গিক হতে হবে, চলতি সমস্যা এবং সমাধানের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

৫. জুমার খুতবা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রতিভাগে ইমামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে। মাঝখানে বিরতির সময় তাকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য বসতে হবে।

৬. ইমাম সাহেবের কণ্ঠস্বর হবে সুস্পষ্ট, তবে বক্তব্য শোনানোর জন্য তার চিৎকার করা উচিত নয়। তার ভাষা হবে সহজ, সরল এবং সহজবোধ্য।

৭. খুতবার সময় কাউকে স্বাগত জানানো অথবা কোন ঘোষণা দেওয়ার জন্য ইমামের খুতবার ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়।

৮. ইমাম খুতবা বা নামাজ দীর্ঘায়িত করবেনা। মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তা সারতে হবে। কার্যতঃ খুতবার সংক্ষিপ্ততা ইসলাম সম্পর্কে ইমামের জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচয়বাহী।

৯. সানি খুতবা তথ্যশূন্য হওয়া উচিত নয়।

১০. খুতবা হচ্ছে একটি বাণী এবং তা কোন কর্ম সম্পাদন নয়। ইমাম বাকপটুতা অথবা কাব্যিক ছন্দ পরিহার করবেন। তিনি এমন সুরে বা আওয়াজে বলবেন না, যাতে সংগীতের সুরমূর্ছনার রেশ থাকে।

১১. খুতবার মধ্যে দোয়া করার সময় ইমামের হাত উঠানো উচিত নয়। আঙ্গুল প্রসারিত করে মোনাজাত করাই শ্রেয়।

১২. ইমাম পূর্বাহ্নেই তার খুতবা তৈরি করে রাখবেন। তার দোয়াও হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং তা মুখস্থ হবে না।[১]

১৩. নামাজের লাইন সোজা না হওয়া পর্যন্ত ইমাম তার নামাজ শুরু করবেন না।

---

[১]. বাংলাদেশে অধিকাংশ ইমাম সাধারণতঃ কোন বই থেকে খুতবা পাঠ করে থাকেন। অবশ্য কোন কোন বিজ্ঞ ইমাম আছেন, যারা খুতবা নিজেরা তৈরি করে আনেন– অনুবাদক।

উৎসব উদযাপন

ইসলামে উৎসব দুটি ঃ ঈদুল ফিতর, রমজানের শেষ হওয়ার পরপরেই যা পালন করা হয় এবং ঈদুল আজহা (কোরবানীর উৎসব) যা জিলহজ্ব মাসের দশতম দিবসে পালন করা হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ধর্মীয় কর্তব্য পালনে তওফিক দেয়ায় খোদার শুকরিয়া আদায়ের জন্য এ দুটো উৎসব পালন করা হয়।

উৎসব পালন

১. দু'ঈদ উপলক্ষে গোসল করা প্রয়োজন। উৎসবের আগের দিন রাতেও; এই গোসল করা যেতে পারে।

২. ঈদের নামাজের জন্য রওনা হওয়ার আগে উত্তম পোশাক এবং প্রসাধনী ব্যবহার উত্তম।

৩. ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার আগে খেজুর বা মিষ্টি খাওয়া প্রয়োজন।[১]

৪. ঈদুল আজহার নামাজের পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু না খাওয়া মোস্তাহাব। নামাজের পর বাড়ি ফিরে কুরবানী করার পর সেই গোশত থেকে তৈরি খাবার খাওয়া উচিত।

৫. খুব বেশি দূরে না হলে ঈদের জামাতে হেঁটে যাওয়া উত্তম।

৬. বাদল-বৃষ্টি ছাড়া ঈদের নামাজ সাধারণতঃ মসজিদে পড়া হয়না। ঈদের নামাজ খোলা মাঠে পড়াই উত্তম।

৭. পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের খোলা ময়দানে সমবেত হতে হবে। এর মধ্যে ঋতুবতী মহিলারা অন্তর্ভুক্ত। তারা ময়দানে হাজির থাকতে পারেন, তবে তাদের নামাজে শরিক না হলেও চলবে।[২]

---

১. আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে সেমাই, পায়েস ইত্যাদি মিষ্টি খাওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে– অনুবাদক।

২. বাংলাদেশে সাধারণতঃ প্রথাগতভাবে মহিলারা ঈদের জামাতে অংশ নেয় না। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও মহিলাদের ঈদের নামাজ হয়ে থাকে– অনুবাদক।

৮. ধীরস্থিরভাবে ইমামের খুতবা শুনা প্রয়োজন।

৯. ঈদের নামাজে যে পথ দিয়ে যাবে, ফেরার সময় সেই পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ দিয়ে আসা প্রয়োজন। এর ফলে বহুসংখ্যক মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া যায়।

১০. এ উপলক্ষে 'তাকাবাল্লাহ মিন্না ওয়া মিনকুম' (খোদা, তোমার জন্য যে এবাদত আমরা করেছি, তা তুমি কবুল কর) বলে মুসলমানদের অভিনন্দন জানানো যেতে পারে।

১১. ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আজহার তিনদিন রোজা রাখা হারাম।

১২. এ উপলক্ষে মুসলমানদের উচিত তাদের সন্তানদের উত্তম পোশাক পরানো, তাদের জন্য মিষ্টি তৈরি করা অথবা কিনে আনা। এই উৎসব পালনের মাধ্যমে তাদের পারদর্শী করে তোলা। ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য এসব কাজে উৎসাহ দান আবশ্যক।

১৩. এ উপলক্ষে কোন মুসলমানের উচিত নয় এমন কাজ করা, যাতে তার পরিবার বিরক্ত হয় বা তাদের উত্তম ধ্যান-ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের নির্দোষ আমোদ আহলাদ বিনষ্ট হয়।

১৪. পিতা এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এসময় ইসলামি আইন যাতে পালিত হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা, এসব উৎসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদার শুকরিয়া আদায় এবং তার বিরোধিতা করা নয়। এজন্য ঈদের সময় ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, যদিও এ ধরনের উৎসবের সময় এগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে যায়।

ঈদুল আজহার করণীয়

জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে কুরবানী দিতে হয় এবং ঈদুল আজহার মেয়াদ তারপর দু'দিন পর্যন্ত থাকে।

১. কেউ হজ্ব পালনরত অবস্থায় থাকলে অথবা হজ্ব না করলেও যে ব্যক্তি 'সাহেবে নিসাব' (যার উপর যাকাত ফরজ) তাকে পশু কুরবানী করতে হবে। কুরবানীর অর্থ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পশু আল্লাহর নামে জবাই করা।

২. কুরানীর জন্য সুস্থ সবল পশু নির্বাচন করতে হবে। যে পশুর কান বা জিহ্বা ক্ষত বিশিষ্ট, যার কান ছেড়া অথবা যে পশু পঙ্গু, তা কুরবানীর জন্য নির্বাচন করা যাবেনা। পশুটি ছাগল বা ভেড়া হলে বয়স হতে হবে এক বছরের বেশি। গরু, বা ষাঁড় হলে দু'বছরের বেশি এবং উট বা মাদীউট হলে তার বয়স হতে হবে পাঁচ বছরের বেশি।

৩. কুরবানীর পশু সমপর্যায়মান দানের অর্থের বিনিময়ে বদলানো যায়না।

৪. কুরবানীর পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ বা উটও হতে পারে। গরু মহিষ বা উট সাতজনে যৌথভাবে দিতে পারে।

৫. ঈদুল আজহা থেকে ফিরে আসার পরপরই কুরবানী করা কর্তব্য। ঈদের আগে কুরবানী দেয়া পরিহার করতে হবে এবং সে কুরবানী হবেনা। নামাজের আগে একটি কুরবানী দিলে নামাজের পর আকেরটি কুরবানী করা যেতে পারে।

৬. কোন ব্যক্তি যদি নিজেই ভাল করে জবাই করতে পারে, তাহলে তার নিজের হাতে পশু জবাই করা উত্তম। নতুবা অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে পশু জবাই করার জন্য।

৭. কুরবানীর পশু জবাই করার ছুরি খুব ধারালো হতে হবে, পশুটিকে কাবামুখী করতে হবে এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে জবাই করতে হবে।

৮. নিজ বাড়িতেই কুরবানী করা যেতে পারে। ঈদের নামাজের স্থলে কুরবানী করা সম্ভব হলে সেখানেই করা ভাল।

৯. যে ব্যক্তি কুরবানী করবে, সে পশুর অংশ বিশেষ ভক্ষণ বা সংরক্ষণ করতে পারে। তবে বেশির ভাগ অংশ গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। এছাড়া আত্মীয়-স্বজনকেও কিয়দংশ বিলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

১০. ঈদুল আজহার প্রথম দিনসহ ৪ দিন পর্যন্ত কুরবানী করা যেতে পারে।[১]

---

১. ইমাম আবু হানিফার মতে কুরবানীর মেয়াদ তিন দিনে সীমিত।

ঈদুল ফিতরের জন্য বিশেষ নির্দেশ

১. রমজান মাসের রোজা পালন শেষে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানকে যাকাত বা সাদাকাহ আল ফিতর দিতে হবে।[২]

২. একজন মুসলমানের প্রতিপাল্য অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের ফিতরাও তাকে দিতে হবে।

৩. ঈদুল ফিতরের নামাজের আগেই গরিবদের মধ্যে ফিতরা দিতে হবে। এর ফলে গরিব মুসলমানরাও ঈদ উৎসবে শরিক হতে পারবে। তবে যদি কেউ ঈদের নামাজের আগে ফিতরা দেওয়ার কথা ভুলে যায়, তাহলে পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ফিতরা দিতে হবে।

---

২. আমাদের দেশে এক ছা' অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম বা তার মূল্য দেওয়া হচ্ছে ফিতরা। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সদস্যের জন্য ফিতরা দিতে হবে।

বিবাহ

বিবাহ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা, যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গ করে। পরিবার ও স্ত্রীর ভরণপোষণে সক্ষম প্রত্যেক যুবকের বিয়ে করা উচিত; কারণ বিয়ের ফলে মানুষ অনৈতিকতা থেকে রক্ষা পায়। ইসলামের কৌমার্যের স্থান নেই। তাছাড়া দু'জনের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য বিয়ের মত আর কিছু নেই।

অর্থনৈতিক কারণে যারা বিয়ে করতে পারেনা তাদেরকে মাঝে মাঝে রোজা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ যৌন আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার জন্য রোজা একটি মাধ্যম। অবশ্য যদি কোন মুসলমানের বিয়ে করার ইচ্ছা বা প্রয়োজন না থাকে এবং সে যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলও হয়, পরিবার ভরণপোষণের জন্য, তাহলে সে বিয়ে করবে না।

পাত্রী অনুসন্ধান

১. ইসলামি আইনানুসারে যে নারী কোন পুরুষের জন্য 'মহরম', সে তাকে বিয়ে করতে পারেনা। রক্তের সম্পর্কের কারণে ৭ শ্রেণীর স্ত্রী লোক এবং বিয়ের কারণে ৭ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।

২. তাকওয়াপরায়ণ নারীই হচ্ছে আদর্শ স্ত্রী। ধনসম্পত্তি, বংশ মর্যাদা অথবা সৌন্দর্যের কারণে সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে করা হয়। বিয়ের এই ভিত্তি কখনও স্থায়ী হয়না এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে তা ভারসাম্যহীন করে তোলে। সুতরাং সমঝোতা প্রতিষ্ঠা ও ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের অভিন্ন ভিত্তি থাকতে হবে এবং তা হচ্ছে ইসলামের প্রতি আনুগত্য।

৩. সপ্রতিভ লজ্জা এবং স্পর্শকাতরতা স্ত্রীর আরেকটি গুণ।

৪. মধ্যম মানের পার্থিব চাহিদায় সন্তুষ্টি, মধ্যম মানের জীবনেই এবং বিলাসবহুল জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষী নয়, এমন স্ত্রী উত্তম। অর্থের অপচয় স্ত্রীর দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

৫. অনাত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের ফলে নতুনদের মধ্যে আত্মীয়তার পরিধি বাড়ে।

৬. বন্ধ্যা নারীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করতে হবে, কারণ সফল বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে সন্তান সন্ততি।

৭. তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করায় কোন ক্ষতি নেই, তবে এক্ষেত্রে সে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হবেনা। যদিও পূর্বোক্ত নারী বিয়ে করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

৮. কোন মহিলার ইসলামি আমলের মাত্রা, তার পিতামাতার জীবনাচরণ থেকে তার পটভূমি এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে অবহিত না হয়ে কোন পুরুষের উচিত নয় বিয়ের প্রস্তাব পেশ করা।

৯. যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করতে চায়, তাকে দেখে নিতে হবে এবং নারীরও উচিত ঐ পুরুষকে দেখে নেয়া।

১০. মহরম ব্যক্তির সামনেই বিয়ের ইচ্ছুক ব্যক্তি সেই নারীকে দেখতে বা সাক্ষাৎ করতে পারে।

১১. পুরুষ শুধু মহিলার মুখণ্ডল ও হাত দেখতে পারবে। মুখমণ্ডল দেখে তার সৌন্দর্য এবং হাত দেখে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

স্বামী নির্বাচনে স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব

কোন নির্দিষ্ট পুরুষকে বিয়ে করার ব্যাপারে নারীর সম্মতি বা অসম্মতির অধিকার যথোচিতভাবে পালন করা উচিত। তবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দুরদর্শী ও প্রাজ্ঞ হতে হবে। ভবিষ্যত স্বামী নির্বাচনে সম্পদ, মান-সম্মান, সুউচ্চ পদমর্যাদা এবং চাকুরি বা অন্য কোন পার্থিব সুবিধা একমাত্র কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যথার্থ নয়।

বিবাহ

১. বিয়ে এবং সন্তান সন্ততি লাভ এমন এক দায়িত্ব যা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

২. ইদ্দত[১] পালনকালে কোন মহিলার প্রতি বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া জায়েজ নয়।

৩. এক ব্যক্তি কোন নারীর প্রতি বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর আরেকজনের পুনরায় প্রস্তাব দেওয়া অভদ্রতা। একজন প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেই আরেকজন বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে।

৪. নারীর অভিভাবকের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নেই। যে কোন চাপমুক্ত থেকে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র নারীরই রয়েছে।[২]

৫. সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের মতামত নিতে হবে। সে যদি এতিম বা কুমারী হয় এবং লজ্জাবশত কোন কিছু না বলে, তাহলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু সে যদি তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা হয়, তাহলে নীরবতাকে সম্মতি ধরে নেয়া চলবেনা। যদি মহিলা অসম্মত হয়, তাহলে তার মতের বিরোধী কাজ করা অভিভাবকদের উচিত হবে না।

৬. কোন মহিলার কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া উচিত নয়। প্রস্তাব দিতে হবে অভিভাবকদের মাধ্যমে।

কাবিননামা

১. বিয়ের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম।

২. নারীর অভিভাবক ও দু'জন মুসলমান স্বাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিয়ের চুক্তি বা কাবিননামা সাক্ষর করা যাবেনা।

৩. স্থায়ী বিয়ের উদ্দেশ্যেই দম্পত্তি বিয়ে করবে, সাময়িকভাবে নয় যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

৪. আদর্শ ও উত্তম বিয়ে হচ্ছে যা বরের ওপর খুব কম চাপ সৃষ্টি করে।

৫. বিয়েতে উপঢৌকন বা উপহার প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরকে তার স্ত্রীর জন্য কিছু উপহার দিতে হবে, তার মূল্য যা-ই হোকনা কেন। তবে এ ব্যাপারে তাকে অমিতব্যয়ী হলে চলবেনা এবং সাধ্যের অতিরিক্ত উপঢৌকন দেবেনা।

---

১. বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর এ সময় সে বিয়ে নাও করতে পারে।

২. মালিকি মাজহাব মতে ওয়ালীর সম্মতি ছাড়া কোন কুমারী বিয়ে করতে পারেনা।

৬. কোন ব্যক্তি যদি তার কন্যা অথবা বোনকে এই শর্তে বিয়ে দিতে চায় যে, অপর ব্যক্তিও তার কন্যা বা বোনকে বিয়ে দেবে কোন প্রকার উপহার বা উপঢৌকন ছাড়া, তবে তা নিষিদ্ধ। মোটকথা প্রত্যেক বিয়ের চুক্তি হবে অন্য বিয়ের চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

৭. মেয়ের অভিভাবকে অবশ্যই পুরুষ ও মুসলিম হতে হবে। কোন মহিলার পক্ষে অন্য মহিলাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া অভিভাবক ছাড়া কোন নারীর বিয়ে করাও উচিত নয়।

৮. যে নারীর কোন অভিভাবক নেই অথবা এমন অভিভাবক রয়েছে, যে মুসলিম নয় অর্থাৎ অনৈসলামিক আইনে তিনি স্বীকৃত হতে পারেন, তার ইসলামি আইনে নয়– এসব ক্ষেত্রে মুসলিম বিচারক অথবা ইমাম হচ্ছে তার অভিভাবক।

৯. নারী ও পুরুষের উভয়ের সম্মতিও ইসলামি মতে বিয়ের জন্য অপরিহার্য।

বিবাহের অনুষ্ঠান

১. উৎসবের আয়োজন না করে গোপনে বিয়ে করা ইসলামের ঐতিহ্য নয়। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করাই ইসলামি বিধানসম্মত।

২. বিয়ে উপলক্ষে আমোদ প্রমোদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামে সঙ্গীত স্বাভাবিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও বিয়ের সময় গান গাওয়ার অনুমতি রয়েছে। স্ত্রীকে যখন স্বামীর কাছে সমর্পণ করা হয়, তখন কনের সাথে গান গাওয়ার জন্য কাউকে পাঠানো যায়; কিন্তু এ সঙ্গীতের বিষয়বস্তু অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে এবং গানের আওয়াজে যাতে প্রতিবেশীদের বিঘ্ন না ঘটে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. বিয়ের অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় খরচের জন্য বরকে বলা নবদম্পতির জন্য সমস্যা হতে পারে সেটিকে অনৈসলামিক প্রথা হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. হজ্ব বা ওমরাহ[৩] পালনকালে বিয়ে করা বা অন্যের বিয়ের আঞ্জাম দেয়া উচিৎ নয়।

---

৩. ওমরাহ হচ্ছে মক্কায় গমন; তবে তা হজ্বের মত বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করতে হয়না। তাছাড়া এটা বাধ্যতামূলক নয় এবং এর কার্যক্রমও সীমিত।

দাম্পত্য জীবন

১. ইসলামে মধুচন্দ্রিমার কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এটি একটি বহিরাগত ঐতিহ্য।

২. বিয়ের প্রথম পর্যায়ে দম্পতির গৃহে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের অহরহ যাতায়াত না করাই শ্রেয়।

৩. সহবাস প্রক্রিয়ায় ভদ্রতা, সূক্ষ্মতা এবং সহৃদয়তা অপরিহার্য।

৪. স্বামী-স্ত্রীর জন্য সহবাসের সময় পরিচ্ছন্ন শরীর এবং সুগন্ধময় পরিবেশ থাকা প্রয়োজন।

৫. স্বামী স্ত্রীর কাছে ভদ্রভাবে অগ্রসর হবে এবং দু'জনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়– এমন কিছু করবেনা।

৬. স্বামী তার স্ত্রীর কপালে হাত রেখে খোদার রহমত কামনা করে দোয়া করবে ঃ "হে খোদা, আমি তার ও তার মেজাজ মর্জির কল্যাণ চাই এবং তার ও তার স্বভাবের অকল্যাণকর দিক হতে পানাহ চাই।"

৭. সহবাসের আগে স্বামী-স্ত্রীর দু'রাকাত নামাজ পড়া উত্তম।

৮. যে কোন উপায়ে সহবাস করা যায়, তবে তা সুনির্দিষ্ট যৌন পথে করতে হবে।

৯. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একবার সহবাস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে স্বামীর পুনরায় অজু করা উচিত।

১০. সহবাসের পর গোসল ছাড়া ঘুমানো যায়, তবে অজু বা গোসল করে নেয়া উত্তম।

১১. রক্তস্রাবকালে স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তারপরও সহবাস করা হলে স্বর্ণের অর্ধ-দিনার সাদকাহ্ করতে হবে। স্বামী তার রক্তস্রাবরতা স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া সবকিছুই (যথা আলিঙ্গন, চুম্বন) করতে পারে।

১২. স্ত্রীর মাসিক শেষ হলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা গোসল করার পর সহবাস করা যেতে পারে।

পুরুষদের প্রতি পরামর্শ

১. সাময়িক বিরতিতে স্বামীর সাথে সহবাসের অধিকার রয়েছে স্ত্রীর। সুতরাং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এই কর্তব্যে অবহেলা করা উচিত নয়।

২. দিবসে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি এবং দুর্ব্যবহার করা হলে অপরাহ্নে বা রাতে সহবাসের পরিবেশ থাকেনা। এজন্য এ সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করাই শ্রেয়।

৩. স্বামীর এমন ঔষধপত্র না খাওয়া বা প্রস্তুতি না নেয়া উচিত, যাতে তার যৌন আকাঙ্ক্ষা দুর্বল বা কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠে।

৪. অতিরিক্ত সহবাস কখনও কখনও ক্ষতির কারণ হতে পারে। এজন্য মধ্যমপন্থা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

৫. পুরুষের উচিত তার দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুবাসিত রাখা।

মহিলাদের প্রতি পরামর্শ

১. রমজান মাসে রোজা রাখা অবস্থায়, রক্তস্রাবকালে, সন্তান প্রসবের পর অথবা শারীরিকভাবে সামর্থ্য না হওয়া ছাড়া সহবাসের ব্যাপারে স্বামীর অনুরোধ স্ত্রী কখনও উপেক্ষা করবে না, স্বামীর ইচ্ছা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যেভাবেই প্রকাশ করা হোক।

২. স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে রোজা রাখতে চাইলে, রোজা রাখার জন্য তার স্বামীর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। স্বামী অনুমতি না দিলে রোজা রাখা যাবেনা। এর কারণ তার স্বামী হয়তো স্ত্রীর সাথে সহবাসে আগ্রহী হতে পারে।

৩. স্বামীর সাথে খেলাধুলা বা হাস্যরসের ব্যাপারে উদ্যোগী না হওয়া এবং সহবাসের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার পরিণতিতে স্বামী ক্ষুব্ধ হতে পারে এবং তাদের বিবাহ-বন্ধনে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

৪. বাড়িতে স্ত্রী অবশ্যই তার স্বামীর সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্যময়ী ও সুবাসিত থাকার চেষ্টা করবে।

বিবাহের ওয়ালিমা

বিয়ের পরদিন স্বামী তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ, ধন্যবাদ দান, দোয়া কামনা করার জন্য তাদেরকে বিয়ের ওয়ালিমার দাওয়াত দেবে।

১. হালকা নাস্তা দিয়ে হলেও ওয়ালিমার আয়োজন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি ঐতিহ্য। অনৈসলামিক প্রকৃতির না হলে ওয়ালিমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা যাবেনা। আমন্ত্রিতদের দাওয়াত গ্রহণ ও যোগদান করা উচিত।

২. বিয়ের (যৌন মিলনের মাধ্যমে বিয়ের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি) পর ওয়ালিমার অনুষ্ঠান করা উচিত, তার আগে নয়। বিয়ের পর তিন দিনের মধ্যেও তা হতে পারে। এটাই সুন্নাহর নিয়ম।

৩. ধনী-গরিব নির্বিশেষে ধর্মভীরু ও তাকওয়াসম্পন্ন মুসলমানদের ওয়ালিমায় দাওয়াত দিতে হবে। সবচেয়ে খারাপ ওয়ালিমা হলো সেটি, যেখানে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, গরিবদের দেওয়া হয় না।

৪. ওয়ালিমার ভোজে এক বা একাধিক ভেড়া জবাই করা যেতে পারে।* মিষ্টি বা সাধারণ নাশতা পরিবেশনও করা যেতে পারে।

৫. আমন্ত্রিত অতিথি এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল, তারা এই ওয়ালিমার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বা খাবার যোগান দিতে পারেন।

৬. অতিথি ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করতে অথবা দাওয়াতনামা পাঠাতে হবে।

৭. নববধূ অতিথিদের আপ্যায়ন করাতে পারে।

৮. ওয়ালিমা অনুষ্ঠান যেহেতু খোদার রহমত কামনার অনুষ্ঠান, এজন্য এক্ষেত্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ।

---

* বাংলাদেশে বিয়ের ওয়ালিমায় গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃছাগল বা গরু জবাই করা হয়। শহরাঞ্চলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্লাব বা কম্যুনিটি সেন্টারে ভোজের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে মুরগীর রোস্ট এবং গরু বা ছাগলের গোশত পরিবেশন করা হয়– অনুবাদক।

বহুবিবাহ

১. ইসলামি বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে সে তার সাথে সাত রাত কাটাবে এবং এর পর প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে সমভাবে সময় বণ্টন করে দেবে; তবে সে যদি এমন মেয়েকে বিয়ে করে ইতোপূর্বে যার বিয়ে হয়েছিল, তাহলে তার সাথে তিন রাত কাটিয়ে এরপর স্ত্রীদের মধ্যে সময় ভাগ করে দেবে।

২. সকল অবস্থায় সকল স্ত্রীর সাথে সমভাবে আচরণ করতে হবে এবং তাদের কাছে থাকতে হবে।

৩. স্বামী অসুস্থ হলে কোন্ স্ত্রী তার কাছে থাকবে, তা স্ত্রীরাই নির্ধারণ করবে।

৪. সমভাবে সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস জরুরি নয়। স্বামীর সময় স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া প্রয়োজন এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে রাত্রিযাপন করা প্রয়োজন।

৫. স্বামী সফরে যেতে চাইলে লটারির মাধ্যমে কোন্ স্ত্রীর সাথে যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৬. স্বামী 'হজ্ব' বা 'উমরাহ' করতে চাইলেও একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৭. কোনো স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত 'পালা' সে যদি অন্য স্ত্রীর জন্য ছেড়ে দেয়, তাহলে স্বামী ঐ স্ত্রীর সঙ্গদান করতে পারেন।

৮. যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়বিচার কায়েম করতে না পারেন (হৃদয়ের টান ও অনুভূতি ব্যতিরেকে), তাহলে তার একাধিক স্ত্রী বিয়ে করা উচিত নয়।

জন্ম

ঘোষণা

১. যদি এমন ব্যাপার হয় যে, কোন শিশুর জন্মের খবর বন্ধুর কাছে প্রথম নিয়ে যাবার সে-ই মাধ্যম হয়, তাহলে তাকে উদ্যোগ নিয়ে খবরটি তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

২. মেয়ে শিশুর জন্মের খবর ছেলে সন্তানের জন্মের খবরের ন্যায় স্বাগত জানাতে হবে এবং খোদার শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

৩. শিশুর জন্মের পর প্রথম করণীয় হলো ঃ তার কানে আজান পৌঁছে দেয়া।

৪. দ্বিতীয় বিষয়টি (ফরজ না হলেও) হচ্ছে ঃ একটি খেজুর চিবিয়ে চিবিয়ে নরম রস তৈরি করে শিশুর মুখে দেয়া এবং শিশুর জন্য দোয়া করা। এটা 'তাহনিক' নামে পরিচিত এবং রাসূল (সা.) কখনও কখনও এরূপ করেছেন।

৫. শিশুর জন্মের পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামকরণ করতে হবে। নামকরণ সম্পর্কে ১৪নং অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৬. শিশুটি যদি উভয় লিঙ্গের হয়, তাহলে এমন নামকরণ করা উচিত, যা ছেলেমেয়ে উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

৭. মৃত সন্তান প্রসব হলে তার নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

অভিনন্দন ও পরিদর্শন

১. নতুন শিশুর আগমনে পিতামাতাকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এই শিশু জন্মের সাথে তাদের আনন্দে শরিক হওয়া। অভিনন্দন জ্ঞাপন যে কোন প্রকারে হতে পারে; শিশুর জন্মের জন্য পিতামাতার প্রতি রহমত আসুক –এই কামনা করাই সুন্দর অভিনন্দন।

২. ছেলে সন্তান জন্মের জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো এবং মেয়ে হলে না জানানো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী আচরণ।

৩. অভিনন্দনের জবাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে হবে– "আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন এবং আপনাকে আরো শিশু সন্তান দিন।"

সপ্তম দিনের উৎসব

শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে পরিবারের পক্ষ থেকে জন্ম উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবের দুটি অংশঃ একটি পশু জবাই করে আকিকা করা এবং শিশুর মস্তক মুণ্ডন করা।

পশু জবাই করা

খোদার রহমত কামনা এবং নতুন শিশুকে বালামুছিবত থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে পশু জবাই করা হয়। এতে নিম্নোক্ত নিয়মকানুন মানা হয় ঃ

১. এ উপলক্ষে একটি পশু জবাই করা। ভিক্ষার আকারে এর মূল্য দিলে চলবে না।

২. পশুটি ছাগল, ভেড়া, গরু বা মাদী ও পুরুষ উট হতে পারে।

৩. এই জন্তু নির্বাচনের ব্যাপারে কুরবানীর পশুর নির্বাচনের নিয়ম প্রযোজ্য (১১ নং অধ্যায় দেখুন)

৪. পশু জবাইকারী ব্যক্তি বলবে– "বিসমিল্লাহে আল্লাহুম্মা হাজা মিনকা ওয়া আলাইকা" (আল্লাহর নামে জবাই করছি। হে খোদা তোমার হুকুম তামিলের জন্য এটা করছি)।

৫. পশুর রক্ত দিয়ে শিশুর মাথা, দেয়াল বা অন্যকিছু রঞ্জিত করা নিষিদ্ধ।

৬. পশুর গোশত তিন অংশে ভাগ করা উচিত– একাংশ পরিবারের জন্য, অপর দু'অংশ আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং দরিদ্রদের জন্য।

৭. পশুর চামড়া বা মাথা বিক্রি করা অথবা কসাই বা পাচককে ফি হিসেবে দেওয়া যাবেনা।

৮. কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে ভোজনের জন্য দাওয়াত করা উচিত।

শিশুর মস্তক মুণ্ডন

জন্মের সাতদিন পর শিশুর মস্তক মুণ্ডন করতে হবে। মুণ্ডিত চুল ওজন করে তার সমপরিমাণ রূপা গরিব ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। একইদিন মস্তক মুণ্ডনের পর সম্ভব হলে শিশুর মাথায় জাফরান ঘষে দিলে ভাল হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েরা যাতে কানে রিং পরতে পারে, সেজন্যে মেয়ে শিশুদের কান-ফোঁড়া করা যেতে পারে।

খতনা উৎসব

১. প্রত্যেক মুসলিম ছেলেকে খৎনা করতে হবে। ইসলামের এই ঐতিহ্য হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে চালু।

২. খৎনা কাজে পারদর্শী ব্যক্তিকে এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

৩. খৎনা করার সময় লিঙ্গের অগ্রভাগ উন্মুক্ত করার জন্য অগ্রত্বক অবশ্যই অপসারণ করতে হবে। তবে লিঙ্গের অগ্রত্বক সম্পূর্ণ অপসারণ করা জরুরি নয়।

৪. অগ্রত্বক ছাড়া কোন শিশুর জন্ম হলে স্বাভাবিকভাবে তার খৎনা করার প্রয়োজন নেই।

৫. শিশুর স্বাস্থ্য যদি খৎনা করার উপযোগী না হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে খৎনা করতে হবে।

৬. ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিম যুবক বা বৃদ্ধ যাই হোক, স্বাস্থ্য বিপন্ন না হলে তার খৎনা করতে হবে।

৭. জন্মের পরপরই খৎনার কাজ সম্পাদন করা উচিত। তবে চিকিৎসাগত কারণে অপারেশন বিলম্ব করা উচিত বলে মনে করা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

৮. ধর্মপিতামাতা এবং পবিত্র পানিতে সিঞ্চন করার মত অন্যান্য বিষয় ইসলামে নিষিদ্ধ।

নামকরণ ও অন্যদের সম্ভাষণ

নামকরণ যেকোন সমাজে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইসলামি সমাজে নামকরণের বেশ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে।

নামকরণ

১. সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর নামকরণে পিতামাতার বিলম্ব করা উচিত নয়। শিশুর জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অগ্রাধিকার দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে নামকরণ করতে হবে।

২. নামকরণের ব্যাপারে পিতামাতা একমত হলে, সেটা খুবই ভাল। যদি তা না হয়, তাহলে পিতার অধিকার হচ্ছে নামকরণ করার।

৩. পিতামাতার উচিত সন্তানদের উত্তম সৌন্দর্যময় ও অর্থবহ নামকরণ করা।

(ক) কতিপয় উত্তম নাম হচ্ছে ঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান এবং আবদুর রহিম।

(খ) নামের দুটো অংশ রয়েছে। প্রথমাংশে আব্দ (দাস) সংযুক্ত হয় আল্লাহর কোন 'ছিফাত' এর সাথে এবং এ ধরনের নাম চমৎকার।

(গ) ফিরিশতাদের নাম, যেমন জিবরাইল প্রভৃতি পরিহার করা প্রয়োজন।

(ঙ) যে সব নাম ব্যক্তির চমৎকার নৈতিক চরিত্র, সততা, আনুগত্য বা পবিত্রতা বুঝায়– তা পরিহার করতে হবে। স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যবোধকতা এক্ষত্রে বাঞ্ছনীয়।

(চ) আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তির দাস এমন অর্থ হলে; যেমন আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের দাস), আব্দুন্নবী (নবীর দাস)– প্রভৃতি নামকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ।

(ছ) হর্ষ, বিষাদ, যুদ্ধ এবং অনুরূপ অবস্থা– যেমন 'হুজন', 'হার্ব প্রভৃতি নির্দেশ করে এমন নাম পরিহার করতে হবে।

(জ) পূর্ণাঙ্গ নামের প্রধান উপকরণ হচ্ছে প্রথম নাম, পিতার নাম এবং উপনাম। প্রত্যেক শিশুকে তার পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে এবং তার প্রকৃত পিতার বংশ নামে ডাকতে হবে। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য এবং তাদের পারিবারিক নাম অক্ষুন্ন রাখা এবং তার স্বামীর নামের পক্ষে তা ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা তার জন্য অবমাননাকর এবং এটা পরিহার করতে হবে।

(ঝ) শুধু মানুষের জন্য নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, সড়ক, স্কোয়ার ও শহরের নামকরণের ক্ষেত্রেও এটা গুরুত্বপূর্ণ।

(ঞ) মানুষ অথবা স্থানের নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা করা প্রয়োজন। নিষিদ্ধ নাম পরিবর্তন করা জরুরি।

অন্যান্যদের সম্বোধন করা

১. বাজার, সড়ক বা অন্যান্য স্থানে দূর থেকে কাউকে ডাকা ভদ্র আচরণ নয়। এক্ষেত্রে সম্বোধনের আগে ব্যক্তির নিকটবর্তী হওয়াই শ্রেয়।

২. জনগণকে তাদের নাম বা পদবী দ্বারা সম্বোধন করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষক বা পিতামাতাকে তাদের প্রথম নামে ডাকা উচিত নয়, কারণ সেটা অভদ্রতার শামিল।

৪. ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকলে তার সংক্ষিপ্ত নাম ধরে ডাকা একটি উত্তম কাজ।

৫. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পূর্ণ অনুমোদন সাপেক্ষে তার উপনাম বা পদবীর সাহায্যে ডাকা যেতে পারে।

৬. কোন ব্যক্তির সাথে পরিচয় না থাকলে তার সাথে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বন্ধু বা ভাই– প্রভৃতি সাধারণ শব্দ ব্যবহার করলে সে আহত বা ব্যথিত হবেনা।

৭. কোন অমুসলিম বা দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে পিতৃপুরুষ সূত্রে বা প্রচলিত আপত্তিকর নামে (যেমন, হে মালডিন, হে ঘুষ খোর) সম্বোধন করা গর্হিত কাজ।

সামাজিক জীবন

সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক

ইসলামি সমাজের কতিপয় বিধিবিধান মানা হলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক সমন্বিত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে– প্রথমতঃ অন্যের প্রতি কর্তব্য, দ্বিতীয়তঃ অপরিহার্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করা এবং তৃতীয়তঃ ব্যক্তিগত খারাপ দিকগুলো পরিহার করা।

অন্যদের প্রতি কর্তব্য

১. কথা বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং সামাজিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সুতরাং কি বলা হচ্ছে এবং কিভাবে বলা হচ্ছে তা খুব বিজ্ঞতার সাথে বিবেচনা করে বলতে হবে।

২. সততা ব্যক্তিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলতেও সহায়তা করে। এটা একজন ভাল মুসলমানের অপরিহার্য গুণ।

৩. কথাবার্তার সময় অমায়িক মৌখিক অভিব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অন্যের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যের অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৪. লোকদের কর্মের ভিত্তিতেই মুসলমানকে তাদের বিবেচনা করতে হবে। যারা তার সাথে সদ্ব্যবহার করে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে। কোন মানুষ অন্যের গোপন ইচ্ছা ও চেতনা জানতে পারেনা– এটা বিচারের ভার আল্লাহর। কিন্তু যার অসততা ধরা পড়ে, সে সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও তাকে বিশ্বাস করা যায়না।

৫. সম্মান ও সহৃদয়তার সাথে অন্যের সহিত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৬. ওয়াদা করার আগে মুসলমানকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি এ ওয়াদা রক্ষা করতে পারবেন। অজুহাত দিয়ে এই ওয়াদা খেলাপ করা যাবেনা।

ভাবলে চলবেনা যে, এই অজুহাতই যথেষ্ট। এ অজুহাত অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেল, একথা ভাবলে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে।

৭. একই সঙ্গে বহু প্রতিশ্রুতি দেয়া অথবা বহু লোকের প্রতিশ্রুতি দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ হয়তো তিনি এতগুলো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না।

৮. অন্যান্যের প্রতি সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে ঃ তারা পীড়িত হলে তাদের দেখতে যাওয়া এবং মৃত্যুবরণ করলে তাদের দাফন কাফনে অংশ নেয়া।

৯. যে জনসাধারণকে ধন্যবাদ দেয়না সে খোদার শুকরিয়া আদায় করেনা (হাদিস)।[১] কারো প্রতি কৃত উপকারের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেয়ার উত্তম উপায় হচ্ছে তাকে বলাঃ 'জাযাকাআল্লাহ্ খায়রান' (আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন)।

১০. কোন ব্যক্তি হারাম বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন বিষয় ছাড়া সাহায্য চাইলে মুসলমানের উচিত তাকে সাহায্য করা। কেউ সহযোগিতা চাইলে তাকে দ্বিধাহীন চিত্তে সাহায্য করতে হবে।

১১. দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত। কোন বিয়ের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

১২. কোন মুসলমানের পোশাক, শরীর বা মুখ থেকে পিঁয়াজ বা রসুনের ন্যায় বস্তুর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে অন্যদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলা উচিত নয়।

অপরিহার্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে বলতে গেলে সচ্চরিত্রের মত কোন ভাল গুণ নেই। সর্বোত্তম লোকেরাই সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর খারাপ লোকেরা মন্দ চরিত্রের অধিকারী। সচ্চরিত্রের কয়েকটি দিক তুলে ধরছি, যা সকলের কাঙ্ক্ষিত। একজন মুসলমানের জিন্দেগি হবে নিম্নরূপ ঃ

---

১. আবু দাউদ, তিরমিজি।

১. বিনয়ী হতে হবে এবং কোনরূপ গর্ব করলে চলবে না।
২. কোন আস্থার আসনে বসানো হলে, সেই আস্থা অক্ষুন্ন রাখা দরকার।
৩. সর্বদা সত্য কথা বলবে এবং নির্দেশ মত কাজ করতে হবে।
৪. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি স্নেহদৃষ্টি, দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে।
৫. যার সহায়তা প্রয়োজন তাকে সাহায্য করা এবং সাহায্য না চাইলেও দুঃস্থকে সহায়তা দেয়া প্রয়োজন।
৬. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আসনে থেকে ক্ষমা করা উচিত।
৭. অপরের সৎ চিন্তাকে মূল্য দেয়া উচিত।
৮. অন্যের প্রতি বন্ধুসুলভ হওয়া এবং তাদের সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করা কর্তব্য।
৯. অপরে পরামর্শ চাইলে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেয়া প্রয়োজন।
১০. যে যার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তার সাথে সে ব্যাপারে কথা বলবে না।
১১. জরুরি বা প্রয়োজন নাহলে অন্যের কাছ থেকে কোন কিছু কখনও চাইবে না।
১২. ওয়াদা অক্ষুন্ন রাখা।
১৩. কর্তার রাগ প্রশমিত করা এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া থেকে বিরত হওয়া।
১৪. যারা ইসলামের চর্চা করে, তাদের প্রতি তার সম্পর্কের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
১৫. সর্বদা ধৈর্যশীল হওয়া।
১৬. আগে যার সাথে ঝগড়া হয়েছে, তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে আন্তরিকতা প্রদর্শন করা।
১৭. দায়িত্বদানকারী অথবা নিয়োগকারীর পরিবার ও আত্মীয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করা।
১৮. মিতাচারী হওয়া।
১৯. খোদা যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়া।

২০. তুচ্ছ বিষয় ছেড়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করা।

২১. দুষ্ট লোকদের মোকাবেলায় দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে হবে।

২২. অন্যের সাথে উপহার বিনিময় করা।

২৩. যে ভাল কাজ করতে চায় তাকে ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করা।

২৪. বিবাদমান পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।

২৫. কাজ সম্পাদনের আগে সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে নেয়া।

২৬. অন্যের প্রতি সদয় হওয়া।

২৭. অন্যান্যরা তাকে যা গোপন করতে বলে সেটা এবং অন্যদের ব্যাপারে সে যা জানতে পেরেছে তা গোপন করা।

২৮. কোন মুসলমান মনক্ষুন্ন হয়েছে, এমন কাজ করলে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২৯. যে দুর্ব্যবহার করেছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া, যেন সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়ে।

৩০. প্রফুল্লচিত্তে আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ করা।

৩১. ভাল লোক হলে তাদের সাথে মেলামেশা করা। অন্যথা নির্জনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

৩২. কারো অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করা হলে তার পক্ষে কথা বলা।

৩৩. যে পথ হারিয়েছে তাকে পথ দেখানো বিশেষতঃ ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদেরকে পথ দেখানো।

৩৪. সহজ হতে হবে; তবে বুদ্ধি বিবেচনাহীন হওয়া চলবে না।

৩৫. দানশীল হতে হবে, তবে অমিতব্যয়ী হওয়া যাবে না।

৩৬. দুর্বলের প্রতি সদয় এবং পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

৩৭. কারো সম্পর্কে তথ্যাদি জানার জন্য সে গালিগালাজ বা গালমন্দ করলে প্রতিশোধ না নেয়া অথবা তার সম্পর্কে কিছু জানার জন্য গালিগালাজ না করা।

ব্যক্তিগত খারাপ বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে চাইলে ব্যক্তিগত চরিত্রের কতিপয় নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য পরিহার এবং একই সঙ্গে কতিপয় ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের চর্চা করতে হবে। নিম্নে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা দেয়া হলো যা মুসলমানকে পরিহার করতে হবে ঃ

১. অত্যন্ত ভয় পাওয়া, উত্তেজিত বা আকস্মিকভাবে ক্ষুব্ধ হওয়া।

২. অন্যদের সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখা।

৩. সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে কথা বলা।

৪. ক্ষুব্ধতা বা ক্রোধ প্রকাশ করা (বিশেষত সেটা যদি কোন গরিব মানুষের পক্ষ হতে হয়; তবে ঐব্যক্তি হয়তো নিজেকে বড় ভাবতে পারে, অন্যদের চোখে সে কার্যতঃ তা নয়)।

৫. কাউকে অপবাদ দেয়া।

৬. অন্য লোকের আলোচনা শুনতে যাওয়া যারা চায়না যে সে এই আলোচনায় অংশ নিক অথবা তারা তাকে এড়াতে চায়।

৭. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা।

৮. ভিন্ন লোকের বংশধরদের গালি দেওয়া।

৯. সহযোগী কোন মুসলমানের দুর্ভাগ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

১০. বংশের মৃত পূর্বপুরুষ অথবা পদস্থ আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে গর্ব করা।

১১. অন্যদের দোষত্রুটি বের করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

১২. কোন মুসলমানের সাথে বিরোধ থাকলে, তিন দিনের বেশি কথা না বলা ও এড়িয়ে যাওয়া।

১৩. নিজে দুষ্টের শিরোমনি হয়ে অন্যের প্রতি অপবাদ দেওয়া।

১৪. কোন মুসলমানের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তিনি (স্ত্রী বা পুরুষ) পছন্দ করেন না, যদিও তা সত্য হয়।

১৫. অন্যের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হওয়া।

১৬. অন্যের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হওয়া।

১৭. গোয়েন্দাগিরি করা।

১৮. কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া।

১৯. অন্যদের হিংসা করা।

২০. অন্যান্য মুসলমানদের ঘৃণা করা।

২১. কারো অগোচরে নিন্দা করা।

২২. অন্যদেরকে হাস্যাস্পদ করা, তাদের প্রতি উপহাস করা।

২৩. অন্যদের প্রতি অসততার কাজ করা, প্রতারণা বা বিভ্রান্ত করা।

২৪. আত্মপ্রবঞ্চনা বা আত্মপ্রতারণা করা।

২৫. ধন-লোলুপ এবং কৃপণ হওয়া।

২৬. কাপুরুষ হয়ে নিজের ভয়ভীতি দূর করতে না পারা এবং বিপদ থেকে পালিয়ে যাওয়া।

২৭. সব সময় অসন্তুষ্ট থাকা ও অভিযোগ করা এবং কোন ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া।

২৮. নিজের সাহায্য সহায়তা, দান-দক্ষিণা ও উদারতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

২৯. নিজে স্বার্থপর হয়ে অন্যের কথা না ভেবে নিজস্ব প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি প্রধানতঃ চিন্তাভাবনা করা ও আগ্রহী হওয়া।

৩০. অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে থাকা।

৩১. কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করা।

৩২. পাপিষ্ঠ প্রকৃতির অথবা বিত্তবান বা উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের প্রতি অনাহুত সম্মান প্রদর্শন।

৩৩. উচ্চস্বরে কথা বলা।

৩৪. অন্যের প্রতি কঠোর বা রূঢ় ব্যবহার করা।

৩৫. নিজের প্রশংসা করা অথবা নিজেকে অযাচিতভাবে বড় করে তুলে ধরা।

৩৬. মিথ্যা বলা।

কথা বলা ও শোনা

কথা বলা যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশও বটে।

১. প্রত্যেক মুসলমানের মিতভাষী হওয়া উচিত এবং এটি একটি উত্তম গুণ। হাদিসে বলা হয়েছে, কেউ হয় ভাল কথা বলবে অথবা নীরব থাকবে।

২. নীরব থাকাকে দোষ হিসেবে বিবেচনা করে কোন মুসলমানের শুধু কথা বলার খাতিরেই কথা বলা উচিত নয়। দোষটা হচ্ছে ঃ খারাপ কথা বলা এবং বেশি কথা বলা। যা ভাল তা বলা তার কর্তব্য, নতুবা চুপ থাকা দরকার। চুপচাপ থাকা নিঃসন্দেহে ভাল গুণ, কিন্তু এমনটি করা যাবেনা যাতে মানুষ বিরক্ত হয়।

৩. মুসলমানদের অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং কেউ খুশি হোক বা বেজার হোক সত্য কথা বলতে হবে। তিক্ত হলেও তাকে সত্য কথা বলতে হবে।

৪. মুসলমানদের কথা বলার আগে সতর্ক চিন্তা করতে হবে এবং এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে তাকে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চাইতে হয়।

৫. বক্তৃতায় অনাড়ম্বর ও স্বচ্ছ ভাষা ব্যবহার করা উচিত। বক্তৃতায় অতিরিক্ত সতর্ক ভাব এবং কৃত্রিমতা পরিহার করতে হবে। ভাষাগত দক্ষতা প্রদর্শন অথবা বক্তা অন্যদের চাইতে বেশি জ্ঞানের অধিকারী এটা প্রদর্শনের জন্য অদ্ভুত অলংকারযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়।

৬. যাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে, তাদের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো সৌজন্যের নিদর্শন।

৭. প্রতিটি ঘটনার সাথে একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পৃক্ত থাকে। এজন্যে আলোচিত বিষয় ও ঘটনার মধ্যে শিষ্টতা ও যথার্থতা থাকতে হবে।

৮. প্রত্যেক মুসলমান যা বলছে তার সত্যতা ও নির্ভুলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৯. বক্তৃতা শ্রবণরত লোকেরা যদি বক্তার বক্তব্য অনুধাবন করতে না পারে এবং বক্তৃতার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তাহলে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা ভদ্রতার নির্দশন।

১০. দ্রুত কথা বলা উচিত নয়। অতি ধীরে বা অতি দ্রুত কথা বলা, অতি উচ্চ বা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলা উচিত নয়। এর ফলে শ্রোতারা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে।

বক্তৃতার গ্রহণযোগ্য ভাষা

১. কথ্য ও অশালীন শব্দ যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে।

২. বিদেশী শব্দ ও পরিভাষা পরিহার করা উচিত।

৩. প্রত্যেকের উচিত শ্রুতিমধুর, গ্রহণযোগ্য এবং নৈতিক প্রকাশভঙ্গি অর্জন করা।

৪. মুসলমানের পক্ষে কারো প্রতি অভিশাপ দেওয়া শোভন নয়।

৫. প্রত্যেক মুসলমানের অপশব্দ বা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা অনুচিত। তাকে গালিগালাজপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কটুবাক্য বা অশালীন প্রকাশভঙ্গির জন্য যদি কেউ কারো থেকে দূরে থাকে, সেটা সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রতি কালিমাস্বরূপ।

৬. মৃত ব্যক্তিদের গালিগালাজ করা অন্যায় এবং জীবিতদের প্রতি গালিগালাজের ন্যায় তা একইভাবে নিষিদ্ধ।

৭. নিজের ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করা এবং খোদার প্রতি অবিচার করার অভিযোগ মুসলমানদের জন্য দূষণীয় এবং তা পরিহার করতে হবে।

৮. বিশেষভাবে মুসলমানকে অথবা সাধারণভাবে সকলকে নীচু চোখে দেখা খারাপ বিষয়।

৯. নিজের প্রতি, নিজের সন্তানদের প্রতি, গৃহ ভৃত্যদের প্রতি অভিসম্পাত দেওয়া নিষিদ্ধ।

১০. এমন কতিপয় বক্তব্য যা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী, যেমন, এমন কিছু বলা যাতে খোদার শরিকানা প্রকাশ করে– সেগুলো পরিহার করতে হবে। কোন মুসলমান কখনও বলবেনাঃ "খোদার ইচ্ছা এবং অমুক অমুকের ইচ্ছা হলে।" বরং তার বলা উচিত "একমাত্র খোদা যদি ইচ্ছা করেন অথবা খোদা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে অমুকের মাধ্যমে এটা

পারে।" সে কখনো বলবেনা ঃ "খোদা ও তুমি ছাড়া আমার কোন ভরসা নেই" বরং বলবে ঃ "খোদা ছাড়া আমার কোন ভরসা নেই; তারপর আল্লাহ চাইলে, তোমরা রয়েছো।" সে কখনো বলবেনা ঃ "আমি অমুকের শপথ করে বলছি।"

১১. বায়ু, বৃষ্টি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি দোষারোপ করা নিষেধ; কারণ এগুলো খোদার নির্দেশে সম্পাদিত হয়। বৃষ্টি বা বায়ুকে গালিগালাজের পরিবর্তে বলা যায় ঃ "হে খোদা এগুলোকে রহমত হিসেবে দাও, শাস্তি হিসেবে নয়"। তাছাড়া পোষা মোরগকে গালি দেয়া উচিত নয়, কারণ এরা লোকজনকে ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে দেয়।

১২. কোন মহিলার উচিত নয় অন্য মহিলার সঙ্গে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে অন্তরঙ্গ হওয়া এবং তারপর তার নিজ স্বামীর কাছে অথবা কারো কাছে প্রকাশ করা।

১৩. কোন মুসলমান কোন আলোচ্য বিষয়ে তার জ্ঞানের প্রাধান্য প্রদর্শনের চেষ্টা করবে না, সে বরং বারংবার 'আমি' শব্দ উচ্চারণ পরিহার করবে।

১৪. কোন কাজের জন্য কাউকে দোষারোপ করার ব্যাপারে নমনীয় হতে হবে এবং অন্য লোকের সামনে তা না করাই ভাল।

১৫. কোন মুসলমান, যত ভাল হোকনা কেন, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অন্যের ঈমান আকিদা বা চরিত্রের প্রতি কালিমা লেপন বা গালিগালাজ করবে না।

১৬. কোন মুসলমানের এমন কিছু বলা উচিত নয়, যাতে কারো মনোকষ্ট বা কারো ব্যাপারে ভুল রায় হতে পারে অথবা ভুল উদ্ধৃতি দেয়া হয়ে যেতে পারে। এমন বিষয় যাতে অন্যেরা বিব্রত হয়, তা না করা ও না বলাই ভাল।

১৭. কোন মুসলমান যেমন তার বক্তৃতায় অন্যের প্রতি দোষারোপ বা গালিগারাজ করবে না, তেমনি সে নিজের প্রতিও দোষারোপ বা গালিগালাজ করবে না।

১৮. কোন মুসলমান অন্য কোন ব্যক্তিকে তার উপস্থিতিতে কখনো প্রশংসা করবে না। যদি সে এটা না পারে, তাহলে তার প্রকাশভঙ্গিতে মধ্যম পন্থার অনুসারী হবে। কারণ শুধু খোদাই কাউকে নিষ্কলুষ আখ্যায়িত করতে পারে।

১৯. মুসলমানদের কাজ হচ্ছে ঃ যারা অহরহ অন্যের সমালোচনা করে তাদের থামিয়ে দেওয়া।

২০. অন্যদের সাথে বক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। এটা একজনের মধ্যে সীমিত রাখাই শ্রেয়।

২১. কোন মুসলমান তৃতীয় কোন ব্যক্তির খারাপ দিক বলতে চাইলে তার অনুমতি দেবেনা। তার চাইতে বরং সদিচ্ছা নিয়ে অন্যদের সাথে মেলামেশা ও সাক্ষাৎ করা উচিত। যদি সে অন্য লোকদের সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বক্তব্য শুনতে পায়, তাহলে তার দায়িত্ব হচ্ছে ঃ কথিত ব্যক্তির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখা।

২২. কোন কাজ করার পর মুসলমানের এটা প্রকাশ করা উচিত নয় যে, সেই এটা সম্পাদন করেছে অথবা অন্যভাবে বলার চেষ্টা করা যে, সে এটা সম্পাদন করেছে।

২৩. অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা করা বদঅভ্যাস। বক্তৃতাকালে মধ্যমপন্থা অনুসরণ করা শ্রেয়।

২৪. কোন মুসলমান যে জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সে ব্যাপারে কথা না বলাই ভাল।

২৫. অন্যদের একান্ত আলোচনার সময় আড়িপাতা নিষেধ।

২৬. সহযোগী মুসলমানদের মধ্যেই 'ভাই' শব্দের ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে।

২৭. কোন মুসলমানকে কাফের বলা বা তার ঈমান নাই বলা– সম্পূর্ণ নিষেধ।

২৮. কোন ব্যক্তি থেকে যদি কেউ কিছু জানতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে সালাম সম্ভাষণ জানাবে, ঐ সময় কি ধরনের কাজে ব্যস্ত– তা বিবেচনা করবে, তারপর প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলবে।

২৯. কোন মুসলমান যখন নবী করিম (সা.) সম্পর্কে কথা বলবে অথবা তার সাক্ষাতে নবী (সা.) এর কথা বলা হয়, তখনই সে বলবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)– এটা বলা সুন্নত।

৩০. কোন মুসলমান খোদার ইচ্ছার উল্লেখ ছাড়া ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে

নির্দেশাত্মক পরিভাষা ব্যবহার করবেনা, বলবে ঃ ইনশাআল্লাহ (খোদা যদি ইচ্ছা করেন)।

৩১. কোন মুসলমান অন্য কোন ব্যক্তির সমালোচনা বা গালিগালাজ বা তার দোষ ক্রুটি বলবেনা, যদিও ঐ ব্যক্তি তাকে সমালোচনা বা গালিগালাজ করে এবং তার দোষক্রুটি ধরিয়ে দেয়।

শ্রবণ

মুসলমানদেরকে ঃ

১. যতদূর সম্ভব ভদ্রতার সঙ্গে অন্যের কথা শুনতে হবে।

২. অন্যেরা যখন কথা বলবে, তখন তাদের বাধা না দেওয়া উচিত।

৩. যে ব্যক্তির সাথে কথা বলা হচ্ছে, তার মুখোমুখি হয়ে কথা বলা উচিত এবং তার বক্তব্য আগ্রহের সাথে শোনা উচিত। আলোচিত বিষয়ে আগ্রহ না থাকলেও নিজেকে ধৈর্য ধরতে হবে যদি বিষয়টি ইসলাম, তার নীতি অথবা নবী করিম (সা.) এর বিরোধী না হয়। এক্ষেত্রে হয় কথা বলা বন্ধ করবে অথবা সঙ্গ ত্যাগ করবে।

৪. যে ব্যক্তির সাথে সে একমত নয়, এমন ব্যক্তির সাথে যুক্তিহীন কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

শপথ করা

১. যতদূর সম্ভব শপথ করা এবং শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

২. মুসলমানরা শুধু আল্লাহ, তার কোন সিফাতের নামে শপথ নেবে। নবী, নামাজ, কাবা অথবা কুরআনের ন্যায় কোন কিছুর নামে শপথ নিতে পারেনা।

৩. খারাপ কাজে আল্লাহর নামে শপথ করা মহাপাপ।

৪. কথায় কথায় খোদার নামে কসম করা উচিত নয়।

৫. যদি কোন মুসলমান কোন কিছু সম্পাদনের বা কোন কিছু থেকে বিরত থাকার শপথ নেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেখে যে, কিছু কাজ করাই উত্তম, তাহলে তার শপথ পূরণ না করা উচিত এবং সেজন্যে কাফফারা আদায় করা উচিত।

৬. মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে ঃ শপথ পূরণ করা। সুতরাং শপথ নেয়ার আগে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, অঙ্গীকার পূরণের সামর্থ্য তার আছে।

৭. 'তুমি যদি এটা না কর বা ওটা না কর, তাহলে বউ তালাক দেব'– এ ধরনের হুমকি দেওয়া অরুচিকর এবং মুসলমানদের জন্য অশোভনও বটে। এ ধরনের তুচ্ছ ও শিশুসুলভ প্রসঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গ টেনে আনা উচিত নয়।

৮. কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন ব্যবসা বা আর্থিক লেনদেন, শপথ করা উচিত নয়।

৯. ওয়াদাভঙ্গ করা চলবেনা। কোন মুসলমান যদি ওয়াদাভঙ্গ করে, তাহলে ১০জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে অথবা এদের প্রত্যেককে এক প্রস্থ কাপড় দিয়ে কাফফারা আদায় করতে হবে। যদি সে আর্থিকভাবে এ কাফফারা আদায়ে সমর্থ না হয়, তাহলে তাকে উপর্যুপরি তিনদিন রোজা রাখতে হবে।

১০. কোন মুসলমান যদি ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ করার শপথ নেয়– যেমন যে বস্তুর মালিক সে নয়, তা নিয়ে নেয়া– তাহলে তার উচিত শপথ ভঙ্গ করা।

১১. কোন মুসলমান যদি ইসলাম বিরোধী কোন কাজ সম্পাদন করতে শপথ নেয়, তাহলে তার শপথ পূরণ না করা এবং কাফফারা আদায় করা কর্তব্য।

নজর (ইচ্ছা পূরণের সাথে শপথকে সংশ্লিষ্ট করা)

১. কারো প্রতি খোদার অনুগ্রহের প্রতিদানে খোদার রাহে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করার অনুমতি রয়েছে, তবে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়নি।

২. কোন বিশেষ কাজের জন্য মানত করা শুধু খোদার রাহেই করা যেতে পারে।

৩. খোদার রাহে মানত করলে তা অবশ্যই পূরণ করবে এবং অন্যের নামে মানত করা হলে তা পূরণের ব্যাপারে এড়িয়ে যাবে।

৪. কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে কোন জন্তু মানত করলে, সে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে এর গোশত খাওয়ার নিয়ত না করে থাকে, তাহলে এই মাংস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হাসি

কোন চমৎকার জিনিস দর্শন, কোন সুখবর শুনে বা কৌতুকচ্ছলে আমরা হেসে থাকি।

১. অন্যেরা হাসছে এজন্যে হাসতে হবে, তা ঠিক নয়। হাসির কারণ থাকতে হবে।

২. উচ্চশব্দে বা অরুচিকর শব্দে হাসি দেয়া উচিত নয়।

৩. অট্টহাসির চাইতে যে হাসিতে দাঁতের কিয়দাংশ মাঁড়ি পর্যন্ত দেখা যায়, সেরূপ স্মিতহাসি বা মুচকি হাসি উত্তম।

৪. হাসির উচ্চস্বর নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত; উচ্চ শব্দ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

৫. হাসির জন্য হাসা– বিশেষতঃ তা যদি মিথ্যার জন্য হয়– তাহলে মুসলমানদের হাসা অনুচিত।

৬. কোন জনসমষ্টির মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি এমন থাকে, যে কোন মূল্যে হাসানো যার কাজ, তাহলে মুসলমানদের এরকম মজলিশে বসা উচিত নয়।

৭. অন্য ব্যক্তিকে উপহাসের জন্য হাসা নিষেধ।

কাঁদা

১. সঙ্গতকারণ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কান্না আসা উচিত।

২. আবেগ দমন করা যাচ্ছেনা বলে কাঁদা কাপুরুষের কাজ। তথাপি সংযতভাবে কাঁদা যায়, তবে তা অতিরিক্ত বা উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে নয়।

তামাশা

১. সবসময় গুরুগম্ভীর থাকা, একঘেঁয়েমী পরিহারের জন্য বিভিন্ন মানুষের সাথে হাসি তামাশায় অংশ নেয়া ভাল।

২. হাসি তামাশার সময় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অভদ্র বা পীড়াদায়ক ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩. অতিরিক্ত গাম্ভীর্য এবং বেশি হাসি তামাশা পরিত্যাজ্য; কারণ, এর ফলে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার এবং অন্যের অনুভূতিতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে।

৪. অন্যের অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে, সেজন্যে তামাশার মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. তামাশার সাথে অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক কসরত প্রদর্শন চলবে না।

৬. তামাশাচ্ছলে অন্যের জিনিসপত্র নেয়া যাবেনা।

৭. তামাশাচ্ছলেও মিথ্যা বলা যাবেনা।

অন্যদের সাথে সাক্ষাৎকালে আচরণ

১. তাকে হাসতে হবে। কারণ যে কোন সফল সাক্ষাতের জন্য হাসি অপরিহার্য। তবে শুধু পার্থিব সম্পদের অধিকারী লোকদের দেখে হাসা উচিত নয়।

২. অন্য মুসলমানদের সম্ভাষণ জানাতে তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. ব্যক্তি যেই হোকনা কেন এবং উপলক্ষ্য যাই হোক, সম্ভাষণ জানানোর সময় কারো প্রতি মাথা নত করা চলবেনা।

৪. অন্য লোকদের সাথে সাক্ষাতকালে এবং সম্ভাষণের পর ডান হাত প্রসারিত করে করমর্দন করতে হবে। এর ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়ে।

৫. বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়, এমন ব্যক্তির সাথে করমর্দন করা চলবে না।

৬. কারো হাতে ময়লা থাকলে এবং কেউ এ অবস্থায় করমর্দন করতে চাইলে বিনীতভাবে করমর্দন না করার জন্য ক্ষমা চেয়ে কারণ ব্যাখ্যা করবে।

৭. প্রত্যেক সাক্ষাতে করমর্দন করার জন্য বিব্রত হলে চলবে না।

৮. পুরুষের সাথে পুরুষ এবং নারীর সাথে নারী করমর্দন করবে। যদি কোন নারী পুরুষের সাথে অথবা পুরুষ নারীর সাথে করমর্দন করতে চায়; তাহলে তাকে (নারী/পুরুষ) ক্ষমা চাইতে হবে।

৯. সাক্ষাৎকালে পরিবার সম্পর্কে বার বার প্রশ্ন উত্থাপন সময় ক্ষেপণের কাজ এবং তা একঘেঁয়েমী হতে পারে। এজন্য তাকে এ ধরনের কাজ এড়িয়ে যেতে হবে।

১০. কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের পর সম্ভাষণ না জানিয়ে কথাবার্তা শুরু করলে তার সাথে কথা না ব..ার অধিকার যে কারো রয়েছে।

১১. বসে থাকা অবস্থা কারো সাথে করমর্দনের জন্য দাঁড়ানো অপরিহার্য নয়। অবশ্য এমন কতিপয় উপলক্ষ আছে যেমন কেউ সফর থেকে ফিরে আসার পর সাক্ষাৎ হলে দাঁড়ানো যেতে পারে।

১২. দেখা সাক্ষাৎ শেষ হলে পুনরায় করমর্দন করে বলতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম' (তোমার উপর খোদার রহম হোক)।

১৩. যে ব্যক্তি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত তার সাথে করমর্দন করা আবশ্যক নয়।

১৪. মোনাজাত করার পর করমর্দন করা সুন্নত নয় বরং বলবে 'তাকাব্বাল আল্লাহ' (আল্লাহ আমাদের মোনাজাত কবুল করুন)।

সম্ভাষণ জানানোর আদব

১. সম্ভাষণ জানানোর অভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ফলে বন্ধুত্ব ও পরিচিতি বাড়ে। এটা হৃদ্যতা ও সৌজন্যের কাজও বটে।

২. যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে বা গাড়িতে যাচ্ছেন, তিনি হাঁটারত ব্যক্তিকে, চলমান ব্যক্তি বসা অবস্থার লোককে এবং ছোট দল বৃহৎ দলকে সম্ভাষণ জানাবে। কম বা বেশি একই বয়সের দু'ব্যক্তি দেখা পেল, তাহলে যে কেউ প্রথমে সম্ভাষণ জানাতে পারে।

৩. সম্ভাষণ জানাতে যারা দ্বিধান্বিত হয়না, তারাই উত্তম লোক, সেজন্যে উল্লিখিত বিধিবিধান পালনের ব্যাপারে নমনীয়তা আবশ্যক।

৪. অন্যদের সম্ভাষণ জানাতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম' (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে।

৫. আসসালামু আলাইকুম বলার পরই সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা, 'হ্যালো' প্রভৃতি শব্দে সম্ভাষণ জানানো যেতে পারে।

৬. যে কোন সম্ভাষণের জবাব একইভাবে বা তার চেয়ে ভালভাবে দেওয়া হচ্ছে সৌজন্যের দাবি। জবাবে কমপক্ষে বলতে হবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'

(আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক); আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জবাব হচ্ছে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু (আপনাদের উপর খোদার রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক)।

৭. মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে কালবিলম্ব না করে সম্ভাষণের জবাব দেয়া; অবশ্য বিলম্বের যৌক্তিক কারণ থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।

৮. কোন মুসলমান অন্যকে সম্ভাষণ জানালে, অথবা অন্যরা তাকে সম্ভাষণ জানালে, তার সম্ভাষণ বা জবাবি সম্ভাষণ স্পষ্ট করে শ্রুত হতে হবে।

৯. কোন মুসলমান যদি মনে করে, কোন কারণে অন্য লোকেরা তার 'সালাম' শুনতে পায়নি, তাহলে তাকে পুনরায় অথবা তৃতীয়বার সালাম দিতে পারে। তবে এর অধিক নয়।

১০. নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে পুনরায় সম্ভাষণ জানানোর বিষয়টিকে একঘেঁয়েমী মনে করা ঠিক নয়।

১১. হাতের আঙ্গুল বা তালু প্রদর্শন করে অথবা মাথা নুইয়ে লোকদের সম্ভাষণ জানানো অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

১২. চেনা অচেনা সকলকে সম্ভাষণ জানাতে হবে মুসলমানদের। এর ফলে পরিচিত ও বন্ধুদের সংখ্যা বাড়ে। তবে বাজার-ঘাটে বা জনাকীর্ণ রাস্তায় যেসব লোকজনের সাথে দেখা হয়, তাদের সকলকে সম্ভাষণ জানানো ঠিক নয়।

১৩. একজন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে কোন মুসলমানের কারো কারো নাম বা উপাধি ধরে ডাকা উচিত নয়। সৌজন্যের খাতিরে সাধারণভাবে সকলকে সম্ভাষণ জানাতে হবে যাতে করে সকলেই সম্ভাষিত হয়।

১৪. একদল লোক সম্ভাষণ জানালে সাধারণ সম্ভাষণের মাধ্যমে তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিশেষ কারো নামোল্লেখ করা চলবে না।

১৫. কোন মুসলমানের পাশ দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে এবং সে সম্ভাষণ জানিয়েছে কিনা সন্দেহ হলে তার জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই।

১৬. যদি কেউ একদল লোককে সম্ভাষণ জানায়, এবং এই দলের কোন সদস্য তার প্রত্যুত্তর দেয় তাহলে তাই যথেষ্ট; তবে দলের সকল সদস্য জবাব দিলে ভাল হয়।

১৭. মুসলমান বা অমুসলমান যেই হোকনা কেন, কেউ সম্ভাষণ জানালে তার জবাব দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

১৮. কোন মুসলমানের কারো সাথে দেখা হলে, তার যদি সন্দেহ হয় যে, সে সম্ভাষণের জবাব দেবে কি-না, তাহলে তাকে সম্ভাষণ জানানো তার দায়িত্ব নয়।

১৯. সম্ভাষণ জানানোর সুপারিশ করা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভাষণ এড়িয়ে যেতে হবে, যেমন, কেউ পায়খানা প্রস্রাব করাকালে অথবা ঘুমাতে থাকলে বা ঝিমুতে থাকলে।

২০. মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে কোন মিশ্রিত দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কালে মুসলমানকে বলতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম' (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

২১. এস্তেঞ্জাকালে কেউ সম্ভাষণ জানালে পায়খানা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত মুসলমান জবাব দেবেনা।

২২. কোন মুসলমান বাড়ি ফিরে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্ভাষণ জানাতে অবহেলা প্রদর্শন করবে না।

২৩. ছেলেমেয়েদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের সম্ভাষণ জানানো উত্তম, যদিও শিশুদের উচিত আগে সালাম জানানো।

২৪. যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের কাছে কাউকে পাঠায়, এমন বার্তা নিয়ে যাতে সালাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাহলে সে তাদের উভয়কে বলবে 'আসসালামু আলাইকা ওয়া আলাইহে (তোমার ও তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

২৫. কোন অমুসলমানের কাছে বার্তা পাঠালে তাকে লিখিতভাবে সম্ভাষণ জানানো যায়, আসসালামু আলা মানএত্তেবা আল হুদা' (যারা হেদায়েতের পথে আছে তাদের প্রতি সালাম) বলে।

২৬. একদল লোকের সামনে হাজির হওয়া অথবা কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার সময় সম্ভাষণ জানাতে হবে। বিদায়কালে সাক্ষাতের পর পুনরায় সম্ভাষণ জানাতে হবে। বিদায়কালে সম্ভাষণ জানানোর গুরুত্ব রয়েছে

সবিশেষ, বিশেষ করে দু'পক্ষ যেখানে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেছে অথবা আলোচনাকালে মতানৈক্য হয়েছে; সেক্ষেত্রে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর অর্থ হচ্ছে তাদের মনোকষ্ট আর নেই এবং উভয় পক্ষ সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহী।

২৭. অন্যান্য মুসলমানদের স্বাগত জানানোর সময় মৌখিকভাবে (টেলিফোনে) বা লিখিতভাবে (পত্র ইত্যাদি) শুরু ও শেষ করতে হবে আসসালামু আলাইকুম বলে।

২৮. অমুসলমানদের সম্ভাষণ জানানো অনৈসলামিক নয়, তবে এক্ষেত্রে মুসলমানদের পরিভাষায় অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম বলা যাবে না।

অপরের বাসগৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা

১. অনুমতি না নিয়ে কোন মুসলমানের পক্ষে কারো গৃহে প্রবেশ করা উচিত নয়। পিতামাতার ন্যায় যারা ঘনিষ্ঠজন তাদের কাছ থেকেও অনুমতি নেয়া সৌজন্য বিশেষ। কারণ গৃহে লোকজন এমন কোন পোশাক বা অবস্থায় থাকতে পারে যা তারা অন্যকে দেখাতে রাজি নয়। বিশেষ করে এটা মহিলাদের বেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহিলাদের কাপড় চোপড় ঠিক করতে, চুল ঢাকতে সময় দেয়া প্রয়োজন।

২. কাউকে স্বাগত জানানোর জন্য দরজা খোলা হলে সেই ফাঁকে গৃহে উঁকি দেয়া নিষিদ্ধ।

৩. কোন বাড়িতে প্রবেশের আগে অনুমতি চাওয়ার পূর্বে যেই জবাব দিকনা কেন, দর্শনার্থীর উচিত প্রথমে তাকে স্বাগত জানানো। ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার ধরন হবে এমন, 'আসসালামু আলাইকুম; আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি'? অথবা 'আসসালামু আলাইকুম, আমি (আপনার নাম বলুন) কি ভিতরে আসতে পারি'? প্রথমে সম্ভাষণ না জানালে গৃহে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

৪. দরজা খোলার আগে দর্শনার্থীকে যদি তার পরিচয় বলতে বলা হয়, তাহলে তা অবশ্যই দিতে হবে। শুধু এতটুকু বলা 'এই যে আমি'– ঠিক নয়।

৫. প্রবেশের অনুমতি দেওয়া না হলে, অনুমতির জন্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করা যাবে। এরপরেও যদি অনুমতি দেয়া না হয়, তাহলে দর্শনপ্রার্থীকে চলে যেতে হবে। পূর্ব নির্ধারিত না হলে যে লোকের সাথে দর্শনার্থী সাক্ষাত করতে চান, তিনি তাকে স্বাগত নাও জানাতে পারেন। সুতরাং যদি বলা হয়, তিনি ব্যস্ত আছেন এবং মেহমানদের স্বাগত জানাবেন না, তাহলে তার অপমানবোধ করা উচিত নয়।

৬. দরজায় কারাঘাত করা বা বেল বাজানো, সম্ভাষণ জানানোও ভেতরে প্রবেশের অনুমতির বিকল্প নয়।

৭. দরজায় মৃদু টোকা দিতে হবে, কারণ গৃহে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে অথবা অসুস্থ হতেও পারে। তিনবার করাঘাত করার পরেও যদি কোন সাড়া না মেলে তাহলে দর্শনপ্রার্থীর স্থান ত্যাগ করা উচিত।

বন্ধুদের বাড়িতে

মোলাকাত এবং বিনিময়ের (exchange of visits) ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক জোরদার হয় এবং তা সুস্থ সমাজ জীবনের প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। এর ফলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর হয়, যার স্থান ইসলামে নেই।

১. ইসলামের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ কোন মুসলমান তার মেজবানকে তার সফরের ইচ্ছা সম্পর্কে জানাবে। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি ছাড়া কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে এবং তিনি কোন কারণে তাকে স্বাগত জানাতে অনিচ্ছুক হলে, তার বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়।

২. পূর্ব-নির্ধারিত সাক্ষাৎ অবশ্যই ত্বরিৎ সম্পাদন করতে হবে। পূর্বে নির্ধারিত সময়সূচি পরিবর্তন করার বা বাতিল করার ন্যায়সংগত কারণ থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের উচিত তা অন্যপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া।

৩. রাতের বেলা (এশার নামাজের পর) বা দিবসের ঘুমের সময় ছাড়া অন্য সময় পরিদর্শন করতে যাওয়া উচিত।

৪. পূর্ব-নির্ধারিত হলে মেহমানকে স্বাগত জানানো মেজবানের কর্তব্য। তদুপরি মেহমানকে স্বাগত জানাতে না পারার দরুণ মেজবানের ক্ষমা চাওয়ার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে মেহমানকে অপমানবোধ করলে চলবে না।

৫. ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অন্যান্য স্বার্থপরতা থেকে এই মোলাকাতকে মুক্ত রাখতে হবে। এই মোলাকাতের উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক জোরদার করা।

৬. যে মহিলার স্বামী বাড়িতে নেই, সেক্ষেত্রে 'মহরম' মানুষ ছাড়া তার বাড়িতে যাওয়া পুরুষদের উচিত নয়।

৭. পূর্ব-নির্ধারিত হলেও কোন মুসলমান অনুমতি না পাওয়া এবং তাকে সম্ভাষণ না জানানো পর্যন্ত মেজবানের গৃহে প্রবেশ করবে না।

৮. মোলাকাতকারীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি কারো বাড়িতে গেছেন। এজন্য নিজের জন্য কিছুটা বিব্রতকর হলেও তাকে মেজবানের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে চলতে হবে।

৯. যারা মোলাকাত করতে আসে শুধু তাদের বাড়িতেই মোলাকাত সীমিত রাখা মুসলমানদের উচিত নয়।

১০. মেহমান কখনও মেজবানের সামনে ইমামতি করবেনা অথবা তার অনুমতি ছাড়া মেজবানের নির্দিষ্ট স্থানে বসবেনা।

১১. অন্য পরিবারের সঙ্গে মোলাকাতকালে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হলেই মেহমান মেজবানের স্ত্রী বা কন্যাদের সাথে কথা বলতে পারে। মেজবানের স্ত্রী সঠিক পোশাকে আবৃত হয়ে মেহমানদের আপ্যায়ন করতে পারে।

১২. স্বামী আপত্তি করলে স্ত্রীর উচিত নয় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া।

১৩. মেজবানের বা তার পরিবারের সদস্য কর্তৃক ইসলামি শিক্ষার সুস্পষ্ট লংঘন হলে মেহমানের উচিত চলে যাওয়া। এ ধরনের আচরণ উত্তম মুসলমানের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও অসহনীয়। এক্ষেত্রে মেজবানের আচরণের ব্যাপারে মেহমানকে সবর করতে হবে।

১৪. কোন মুসলমান কারো সাথে মেহমান হিসেবে থাকতে চাইলে, তিনদিনের বেশি আতিথ্য প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। এর বাইরে যা প্রাপ্য তা অনুদান হিসেবেই পাওয়া। কারো বোঝা হয়ে দাঁড়ায়– এরূপ অবস্থা সৃষ্টি পর্যন্ত মেহমানের অবস্থান করা উচিত নয়।

১৫. মেজবান কোন কিছু খেতে দিলে চিকিৎসাগত কারণ অথবা রোজা না থাকলে অসম্মতি জানানো অভদ্রতার শামিল। এক্ষেত্রে ক্ষমা চেয়ে প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

১৬. মোলাকাতকারী যদি পেশাব পায়খানা করতে চায়, তাহলে মেজবানকে জানিয়ে স্থান ত্যাগ করবে।

১৭. অন্যদের সাথে মোলাকাত করতে গেলে অনুরোধ ছাড়া দীর্ঘসময় অবস্থান করা উচিত নয়। দীর্ঘকাল অবস্থান এবং অতিরিক্ত কাল ক্ষেপণ করে নিজেকে নির্বোধ প্রমাণিত করা সুষ্ঠু ইসলামি আচরণের মধ্যে পড়েনা।

১৮. বিদায়ের প্রাক্কালে মেহমান অবশ্যই মেজবানকে আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদ দেবে। তিনি বিদায় নেয়ার জন্য অনুমতি চাইবেন এবং অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অতঃপর মেজবানের কাছ থেকে বিদায় নেবেন।

১৯. কোন মুসলমান অন্যের সঙ্গে মেহমান হিসেবে অবস্থানকালে যদি রোজা রাখতে চায়, তাহলে মেজবানকে তার ইচ্ছার কথা জানানো সৌজন্য বিশেষ।

২০. যদি কোন বন্ধু বা আত্মীয় দেখা সাক্ষাৎ করতে না আসে, তাহলে কোন মুসলমানের উচিত নয় একই আচরণ করা। সে তার সাথে মোলাকাত করবে এবং তার মোলাকাতের জন্য অপেক্ষা করবে না।

২১. মুসলমানদের উচিত নয় শুধু বিশেষ উপলক্ষে মোলাকাত সীমিত রাখা। আগেই বলা হয়েছে, মোলাকাত বা বিনিময়ের ফল সব সময় ফলপ্রসু হয়ে থাকে।

মেহমানদের স্বাগত জানানো

১. মুসলমানদের উচিত তার মেহমানদের আন্তরিকতার সাথে এবং সহাস্যে স্বাগত জানানো। মেহমানের প্রতি সম্মান ও আপ্যায়ন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যতম কর্তব্য।

২. মেজবানের উচিত মেহমানের কাছ থেকে বিরক্তির সকল উৎস দূরে সরিয়ে রাখা।

৩. মেহমানকে কোন প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করতে বলা অভদ্রতা।

৪. বেশ ক'দিনের জন্য আগমন ও অবস্থানের জন্য মেহমানের কোন দাওয়াতের প্রয়োজন নেই। তবে তার আসার ব্যাপারে মেজবানকে আগাম জানিয়ে দেয়া ভাল। মেহমান তিনদিন অবস্থান করার পর চলে যেতে পারে।

৫. কোন মুসলমানের কাছে মেহমান মোলাকাত করতে আসলে সামর্থ্য অনুযায়ী সমাদর করা এবং তাকে খাদ্য ও পানীয় দেয়া কর্তব্য। অবশ্য তার সাথে মোলাকাত করতে গেলে এই ব্যবহার পাওয়া যাবে কিনা সেটা বিবেচ্য নয়।

৬. মোলাকাত শেষ হলে মেহমানের বিদায়ের প্রাক্কালে মেজবানকে তার সাথে বহির্দরজা পর্যন্ত সঙ্গ দিতে হবে এবং তাকে বিদায় জানাতে হবে।

লোকদের আপ্যায়ন

১. কোন মুসলমান তার সাফল্যের ব্যাপারে গর্ব করার ইচ্ছা না থাকলে অন্যান্য লোকদের আমন্ত্রণ জানাতে পরে।

২. শুধু ধনী ও প্রভাবশালী লোকদের নিমন্ত্রণ করলে চলবেনা, গরিব ও অভাবগ্রস্তদেরও আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৩. অন্যান্যদের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও ভাল মুসলমানদের আপ্যায়নের জন্য দাওয়াত দিতে হবে। মুসলমানদের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে আপ্যায়নের ফলাফল যেহেতু বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা, সেজন্য এর লক্ষ্য মুসলমানদের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত।

৪. আপ্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

৫. আমন্ত্রিত মেহমানদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তবে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও বাহুল্য পরিহার করতে হবে।

৬. মেহমানদের স্বাগত জানানোর কলাকৌশলের ক্ষেত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৭. খাবার দেয়ার সাথে সাথে মেহমানরা খেতে শুরু করতে পারলেও তাদের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করতে বলা উত্তম।

৮. মেহমানদের পানাহার করতে বলা এবং অতিরিক্ত না খাওয়ার কথা বলা অভদ্রতা বিশেষ; তবে বিশেষ ধরনের খাবার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়।

৯. মুসলমানদের বক্তৃতা দেবার কালে নিজের উদারতা বা মহত্ত্বের অথবা পরিবেশিত খানাপিনা সম্পর্কে প্রশংসা না করার ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে।

১০. বিশেষ বিশেষ সময়ে আমন্ত্রণ জানানো সীমিত করা উচিত নয়। আমন্ত্রণ যেকোন সময় করা যেতে পারে।

১১. মেহমান যাতে এ ধারণা করতে না পারে যে, সে কি পরিমাণ খাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা অথবা সে অনেক বেশি খাচ্ছে, এরকম চিন্তা ভাবনা মেজবানের রয়েছে।

১২. আকস্মিকভাবে কোন মেহমান এসে গেলে মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তার সুষ্ঠু মেহমানদারি করা।

খাবার জন্য আমন্ত্রিত হলে

১. কোন মুসলমানকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করা হলে তা গ্রহণ করা উচিত। বিবাহ উৎসবের আমন্ত্রণ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে (যদি এতে নিষিদ্ধ কিছু না থাকে)।

২. কেউ যদি আপ্যায়নের জন্য এমন আমন্ত্রণ জানায়, যা হচ্ছে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থে, তবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়।

৩. কেউ নফল রোজা রাখা অবস্থায় আমন্ত্রিত হলে রোজা ভঙ্গ করা অথবা এই আমন্ত্রণ রক্ষা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে।

৪. কারো বাড়িতে খাবার জন্য আমন্ত্রিত হলে কোন মুসলমানের উচিত নয় এমন কাউকে সাথে নেয়া যে আমন্ত্রিত নয়।

৫. যদি কেউ কোন মুসলমানের অনুসরণ করে এবং তার মেজবানের বাড়িতে যাওয়ার সময় সম্মতি ছাড়াই সহযোগী হয় সেক্ষেত্রে মেজবানকে বিষয়টি জানিয়ে রাখা কর্তব্য। মেজবান তার ইচ্ছানুসারে অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমানকে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন।

৬. খাবার পরিবেশন করা হলে তাড়াহুড়া করে খাবার টেবিলে যাওয়া ভদ্রোচিত ব্যাপার নয়। উত্তম পদ্ধতি হচ্ছেঃ তার ডানের ব্যক্তিকে অনুসরণ করা।

৭. প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে ভোজ উৎসবের আয়োজন করা হলে এই আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া অনুচিত।

৮. নৈতিক দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তির আমন্ত্রণ শুধু এজন্য গ্রহণ করা উচিত নয় যে, তাকে না বলা একটা সমস্যা। তাকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা থাকার শর্তে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯. খেতে বসে ৪নং অধ্যায়ে বর্ণিত রীতিনীতি মানতে হবে।

১০. পরিবেশিত খাবারের মধ্যে এমন খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় থাকলে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ, যেমন মদ বা শূকরের মাংস, তাহলে মেজবানকে ওগুলো সরিয়ে নেয়া অথবা চলে যাওয়ার কথা বলতে হবে। এগুলো সরিয়ে নেয়া না হলে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করা উচিত।

১১. মেহমান দাওয়াতের জন্য মেজবানকে ধন্যবাদ দেবেন এবং তার জন্য খোদার রহমত কামনা করবেন। নিম্নোক্ত দোয়া করা যেতে পারেঃ "আকালো তা'মুকুম আল আবরার ওয়া সাল্লা আলায়কুম আল মালাইকা ওয়া আফতারা ইন্দাকুম আস-সায়েমুন" (সালেহ লোকেরা তোমার মাধ্যমে অংশ নিক, ফেরেস্তারা তোমার জন্য দোয়া করুক এবং রোজাদারগণ তোমার সাথে ইফতার করুক)।

অসুস্থদের দেখতে যাওয়া

১. অসুস্থদের দেখতে গেলে, তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলে, তারা অধিকতর স্বস্তিবোধ করেন। এজন্যে সামাজিক সম্পর্ক জোরদার ও বিকাশ লাভ করে। সুতরাং শুধু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনই নয় বরং যারা দূর সম্পর্কের আত্মীয় ও স্বল্প পরিচিতি, সেসব অসুস্থ লোকদেরকেও দেখতে যাওয়া উচিত।

২. অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে নিলে ভাল হয়, তবে তা জরুরি নয়। অসুস্থরা হাসপাতালে থাকলে রোগী পরিদর্শনের সময়সূচি

মেনে চলতে হবে এবং সেখানে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা থাকলে– তাও মেনে চলতে হবে।

৩. অসুস্থতার ধরনের উপর পরিদর্শনের প্রকৃতি ও সময়ের পরিমাণ নির্ভর করে। অসুস্থদের দেখার ব্যাপারে চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে অথবা তাদের সংক্ষিপ্ত সময়ে দেখা যেতে পারে। চিকিৎসকদের অনুমতি থাকলে অসুস্থদের পাশে দীর্ঘ সময় কাটানো আবশ্যক, যাতে করে তারা অনুধাবন করতে পারে যে, তার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে না।

৪. পরিদর্শনকারীকে রোগীর পাশেই বসতে হবে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

৫. রোগী পরিদর্শনকালে তার আরোগ্যের জন্য দোয়া করা উচিত। এই অসুস্থতা পাপ মোচনের জন্যেও হতে পারে। রাসূলে করিম (সা.) রোগী পরিদর্শনকালে বলতেনঃ "লা–বা'স তুাগুর ইনশাআল্লাহ" (কোন ক্ষতির কারণ নেই, যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় সংশোধন করা)।

৬. রোগী পরিদর্শনকারীকে সতর্কতার সঙ্গে সান্ত্বনার বাক্য বেছে বেছে বলতে হবে; ভাগ্যের প্রতি আপত্তিকর কোন মন্তব্য, অসুস্থতাকে পাপ হিসেবে উল্লেখ করা অথবা এমন কোন কথা বলা, যা রোগীর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে– ইত্যাদি বলা গুনাহ। তার চেয়ে এই অসুস্থতা খোদার দেওয়া নিয়তির অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা এবং খোদা সকলের মঙ্গল করুণ– এরূপ ধারণা রাখতে বলা আবশ্যক।

৭. পীড়িত ব্যক্তির অবস্থা নৈরাশ্যকর অবস্থায় উপনীত হলে বলতে হবে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার দিকেই আমরা ফিরে যাব)।

৮. কোন মুসলমানের অসুস্থ ব্যক্তিকে তার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। অসুস্থ ব্যক্তি তার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতাবোধ করলে তার কাছে যখনি প্রয়োজন হয় যাওয়া দরকার।

৯. রোগীর প্রতি উদ্বেগ শুধু রোগী দেখার মধ্যেই সীমিত রাখলে হবে না। সময়ে সময়ে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার পরিবারের কাছে খোঁজ-খবর নিতে হবে।

১০. বন্ধু, প্রতিবেশী বা আত্মীয় অমুসলিম হলেও, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতে হবে। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যও এটা প্রয়োজন।

১১. কুষ্ঠ রোগী বা এ ধরনের রোগ বা পঙ্গু ব্যক্তির প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয়, যদি তারা এতে অপমানবোধ করে।

গ্রুপ বৈঠক

১. সামাজিকতার খাতিরে শুধু সময়ক্ষেপণ এড়াতে হবে। সময় অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ, যা বিনষ্ট করা চলবে না। বরং প্রয়োজনীয় কাজে তা ব্যয় করতে হবে। বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২. সমবেত হওয়ার স্থানও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া চাই; যেমন ব্যক্তি–মালিকানাধীন বাড়ি এবং মসজিদ, রাস্তা বা বাজার নয়।

৩. মেলামেশার সময় কারো শরীর, কাপড় চোপড় বা মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরুলে তাকে এড়িয়ে যেতে হবে।

৪. বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহস্বামীকে স্বাগত জানানোর পর মুসলমানদের উচিত বসে থাকা লোকদের সম্ভাষণ জানানো। ডান থেকে শুরু করে সকলের সাথে তার মোসাফাহ করতে হবে এবং তা শেষ করে সেখানেই বসে পড়তে হবে।

৫. কোন সমাবেশে যোগ দিলে কোন ব্যক্তিকে তার জন্য নির্ধারিত স্থানে আসন নিতে হবে, নতুবা তাকে যে কোন খালি জায়গায় বসতে হবে।

৬. সমাবেশস্থলে কোন ব্যক্তি তার আসন কারো পক্ষে ছেড়ে দিতে চাইলে এটা গ্রহণ না করার জন্য সে বিনীতভাবে ক্ষমা চাইবে এবং সেই স্থলেই বসবে অথবা কাউকে উঠিয়ে দেওয়া ছাড়াই জায়গা করে দিবে অথবা পর্যাপ্ত স্থান থাকলে সেখানে বসবে।

৭. নিজে বসার লক্ষ্যে কাউকে তার আসন ত্যাগের জন্য বাধ্য না করা, যদিও সে শিশু হয়– এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৮. অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দু'ব্যক্তির মাঝখানে বসা শোভনীয় নয়, কেননা তারা হয়তো একান্তভাবে আলাপ করছে অথবা কোন গোপন কথা বলছে।

৯. কারো প্রতি পিছন ফিরে বসা উচিত নয় এজন্যে যে, এই বসাকে কেউ কেউ অশ্রদ্ধা বা অসম্মান হিসেবে ধরে নিতে পারে।

১০. সমাবেশে আরো লোকজন আসলে যারা পূর্ব থেকে বসা ছিল, তারা নবাগতদের জন্য জায়গা করে দেবে।

১১. কোন সমাবেশে কেউ যোগ দিলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যারা উপস্থিত তারা কেউ তার জন্যে দাঁড়াবে না।

১২. যদি কেউ ফিরে আসে এবং প্রয়োজনে তার আসন ছেড়ে বাইরে যায়, তাহলে এই আসনের অধিকার তার-ই এবং অন্যদের উচিত নয় এই আসন দখল করা।

১৩. কোন স্থানে তিন ব্যক্তি থাকলে, এর মধ্যে দু'জন তৃতীয়জনের সামনে একান্তে আলোচনা করবে না।

১৪. দু'ব্যক্তি একান্ত আলোচনায় মত্ত থাকাকালে নবাগত কেউ আসলে, আমন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আলোচনায় যোগ দেবে না।

১৫. তিনের অধিক মানুষ উপস্থিত থাকলে, এদের মধ্যে দু'জন একান্তে বা ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে পারে।

১৬. অন্যদের কথা শোনা ভদ্রতা বিশেষ এবং বাধা না দেওয়া বা অন্যের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্টা করা উচিত নয়।

১৭. কোন ব্যক্তির বসা অবস্থায় বিনীতভাবে এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বসা উচিত।

১৮. সমবেত লোকদের আল্লাহর যিকির করা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর দরুদ শরীফ পড়া উত্তম কাজ।*

১৯. কোন মুসলমান কারো অনুপস্থিতিতে পরচর্চা করতে দেখলে তার উচিত বিনীতভাবে তাদের নিবৃত্ত করা। তারা কথা না শুনলে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে স্থান ত্যাগ করতে হবে।

সমস্বয়ে যিকির করা কোন শর্ত নয়। বরং মনে মনে আল্লাহর যিকির করা ও দরুদ শরীফ পড়া প্রয়োজন। সভা সমাবেশেও এরূপ করা যেতে পারে– অনুবাদক।

২০. সমবেতস্থলে যা বলা বা করা হয়, তা নোট করা এবং হালাল ও হারামের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২১. মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেসব গোপনীয় কথা বলে, তাতে আস্থার ব্যাপার নিহিত থাকে এবং এসব ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকা অতীব ন্যায়সঙ্গত।

২২. এশার নামাজের পর শিক্ষামূলক অথবা কোন অতিথির সৌজন্য ছাড়া বৈঠকাদি করা অনুচিত।

২৩. যেসব বৈঠকাদি সমাবেশ মজলিশে অনেক হৈ চৈ বা অর্থহীন কথাবার্তা হয়, সেগুলোর শেষ পর্যায়ে এবং স্থানত্যাগের আগে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া উচিতঃ সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগ ফিরুকা ওয়া আতুবু আলায়কা (হে আল্লাহ, আমি তোমার সর্বাত্মক উপস্থিতি লক্ষ্য করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।)

কিভাবে বসতে হবে

১. বসার সময় অন্যদের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হলে চলবেনা। অন্যদের সামনে পা ছড়িয়ে দেয়া অথবা অন্যদের চাইতে উঁচু আসনে বসা উচিত নয়।

২. বসার যে কোন ভঙ্গিতে শরীরের গোপন অংশ ঢেকে রাখতে হবে।

৩. বসার সময় বাঁ হাত পিছনে ফেলে অন্যের হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসা অনুচিত।

৪. কোন ব্যক্তি তার দেহের একাংশ সূর্যালোকে এবং অপরাংশ ছায়ায় রেখে বসবে না।

৫. মেঝেতে বসে আহার করা উত্তম।

গৃহের বাইরে মহিলাদের আচরণ

১. যে নারী সুগন্ধী, মেক-আপ অথবা প্রসাধনী ব্যবহার করেছে, মেক-আপ অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রসাধনীর গন্ধ থাকা পর্যন্ত তার গৃহ ত্যাগ করা সমীচীন নয়।

২. কোন নারী তার স্বামী অথবা 'মহরম' পুরুষ না হলে তার বাড়িতে রাত কাটাবে না।

৩. কোন নারী ও পুরুষ 'মহরম' না হলে অথবা স্বামী স্ত্রী না হলে তাদের নিভৃতে থাকার অনুমতি নেই।

৪. কোন মহিলার প্রতি পুরুষের হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আকস্মিক দৃষ্টিপাত অনুমোদনযোগ্য, তবে দ্বিতীয়বার তাকানো নিষিদ্ধ।

৫. নারী ও পুরুষের মেলামেশা অথবা সামাজিক আচরণ দু'ধরনের ঃ

ক) এক ধরনের মেলামেশা হচ্ছে প্রকাশ্যে এবং তা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত নয় এবং সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত, যেমন রাজপথ, বাজার এবং মসজিদ। এসব ক্ষেত্রে মেলামেশার অনুমতি রয়েছে; তবে উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

খ) বিদ্যালয়, বিশ্ববিদাল্যয় অথবা কর্মস্থলের মত বিশেষ সীমিত স্থানসমূহে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম এবং এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পৃথকীকরণ প্রয়োজন।

৬. বাড়ির বাইরে কোন মহিলা পুরুষের সাথে কথা বললে তা আকর্ষণীয় স্বরে হবেনা বরং তা হবে যথাযথ এবং সংক্ষিপ্ত।

৭. পুরুষের জন্য অনুমোদিত সকল ব্যবসা মহিলারা করতে পারেন। বাড়ি এবং পরিবারের কোন মহিলার মূল দায়িত্ব পালনে অসুবিধা সৃষ্টি না হলে, স্বামী রাজি হলে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা না করতে হলে মহিলা চাকুরিও করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা কোন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে বা ডাক্তার হতে পারেন।

৮. বাড়ির উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করার আগে ৫নং অধ্যায়ে বর্ণিত ইসলামি পোশাক এবং হিজাব পরার ব্যাপারে মহিলাদের স্মরণ রাখতে হবে।

৯. ইসলামে গৃহকে মহিলাদের জন্য কারাগার হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই। যুক্তিসঙ্গত কারণে একজন মহিলার যতক্ষণ বাইরে থাকা প্রয়োজন, ততক্ষণ সে বাইরে থাকতে পারে।

উৎসব পালন

১. উৎসব পালন সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধি হচ্ছে ঃ (ক) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলবেনা। (খ) কোন মুসলমান আর্থিকভাবে সচ্ছল হলেও জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং অপব্যয় করা যাবে না।

২. খৃষ্টানদের বড়দিন, নববর্ষ, মাতৃ দিবস (Mother's Day), পিতৃ দিবস (Father's Day), শ্রম দিবস (Labour Day), বিবাহ বার্ষিকী, জন্ম দিবস– এ ধরনের উৎসবের স্থান ইসলামে নেই এবং এগুলো হচ্ছে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুকরণ।

৩. বাহির থেকে বেশ কিছু উৎসবকে ইসলামে চালু করা হয়েছে, যেমন নবীর জন্মদিন, মহানবী (সা.) এর ইসরা ও মিরাজ (মক্কা থেকে রসূল (সা.) এর একরাতে জেরুজালেমে গমন এবং সপ্ত আসমানে গমন), মহানবী (সা.) এর হিজরত ইত্যাদি।

৪. নিষিদ্ধ উৎসব পালনের চাইতে মুসলমানদের নিজ নিজ গ্রাম, শহর বা জেলা শহরে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ, বর্তমান ও ভবিষ্যত সংক্রান্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা অথবা সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা অথবা কুরআন শরীফ অধ্যয়ন এবং আল্লাহর যিকির করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে আচরণ

১. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

২. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মোলাকাত করার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, তবে তারা যাতে অবহেলিত মনে করতে না পারে, সেজন্যে এসব মোলাকাত যথাসম্ভব ঘন ঘন হওয়া প্রয়োজন।

৩. আত্মীয়-স্বজনের সাথে যখনই মোলাকাত হবে, তখনই তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে হবে।

৪. মুসলমানদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার দায়িত্ব রয়েছে। এ জন্যে মাঝে মধ্যে তাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপহার দিতে হবে।

৫. যদি কোন মুসলমানের দুধ-মাতা থাকে, তাহলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তার আরো একটি পরিবার রয়েছে।

৬. আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তাদের মোলাকাতের অপেক্ষা না করে নিজেদেরই যাওয়া উচিত।

৭. আত্মীয়-স্বজনদের একটি অপরাধের জবাব আরেকটি অপরাধের মধ্যদিয়ে দেয়া উচিত নয়। এ ধরনের জবাব না দেয়া নৈতিক সাহসের পরিচয় বহন করে।

৮. মুসলমানদের উচিত খালাকে তাদের মায়ের মতই আচরণ করা।

৯. চাচাকে পিতার মত আচরণ করা উচিত।

১০. পুরুষ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে (মহরম পুরুষ ছাড়া) মহিলারা বসতে পারে যদি–

(ক) শিষ্টাচার বজায় রেখে তারা আচরণ করে।

(খ) কোন আত্মীয়ের সাথে একা কথা বলা বা আলোচনা না করে।

প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

১. প্রতিবেশীর সাথে আচরণের প্রথম কথা হলো ঃ উচ্চ স্বরে কথা বলা অথবা উচ্চ নিনাদের উৎসব আয়োজন (বিশেষতঃ রাতে) করার মত উপদ্রব বা নৈতিক ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা।

২. প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রতিবেশীর বাড়িতে গমন গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে জন্ম, মৃত্যু, অসুস্থতা ও বিবাহের ন্যায় বড় বড় ঘটনায় প্রতিবেশীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন।

৩. নবীর (সা.) শিক্ষা অনুসারে প্রতিবেশীর প্রতি উদার হওয়া দরকার।

প্রতিবেশীকে মাঝে মধ্যে খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানানো এবং খাবার পাঠানো উচিত।

৪. প্রতিবেশীর সন্তানের প্রতি কোন প্রকার অসদাচরণ করা অন্যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, সন্তানদের বিরোধ যেন তাদের পিতামাতার মধ্যে' ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না করে।

৫. প্রতিবেশী ও তার পরিবারের বিশেষ অধিকার রয়েছে মুসলমানদের উপর। বিপদ আপদের সময় তাদের সাহায্য করা হচ্ছে ইসলামি আচরণের দাবি।

৬. কোন মুসলমান যদি জানতে পারে যে, তার প্রতিবেশী আর্থিক সংকটে রয়েছে, তাহলে সে সাহায্যের অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করে সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিবে।

৭. প্রতিবেশীর গোপন কথা, গোপন রাখতে হবে অথবা এমন তথ্য যা সে বাইরে শুনেছে, তা গোপন রাখতে হবে।

৮. প্রতিবেশী সম্পর্কে ভাল তথ্য দিতে হবে, তার সম্পর্কে খারাপ কথা বললে তা খণ্ডন করবে, কারণ তার সাথে তার সম্পর্ক বিশেষ দৃষ্টি দানের দাবি রাখে।

৯. মহিলা প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা গৃহবধূর দায়িত্ব।

১০. প্রতিবেশী যদি আত্মীয় হয়, তাহলে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১১. শুধু নিকটবর্তী প্রতিবেশীর সঙ্গেই সসুম্পর্ক বজায় রাখলে চলবেনা; বরং দূরের প্রতিবেশীর সঙ্গেও তা রাখতে হবে।

উপহার

ব্যক্তির মধ্যে উপহার বিনিময়কে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে এজন্যে যে, এর ফলে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোন মুসলমান আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে, সে তার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দেয়ার চেষ্টা করবে। পাশাপাশি তাকে নিম্নোক্ত বিধান মেনে চলতে হবেঃ

১. অন্যদের উপহার দেয়ার চাইতে আত্মীয়-স্বজনদের উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে ঃ

২. বাহুল্য উপহার দেয়ার চাইতে বিস্তর অর্থ খরচ এবং সেগুলো নির্বাচনে অনর্থক সময়ক্ষেপণ করার ফলে উপহার বিনিময় সীমিত করে দেয়; এমনকি এর ফলে উপহার বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়।

৩. বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকেই শুধু উপহার ক্রয় করা উচিত।

৪. অন্যদের উপহার প্রদানের উদ্দেশ্য হতে হবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সম্পর্ক জোরদার করা। পার্থিব সুবিধালাভ বা ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের আশায় উপহার প্রদান ঘুষের শামিল, যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৫. উপহার প্রদানকালে এমন আলোচনা পরিহার করতে হবে, যার ফলে গ্রহীতার মনে উপহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

৬. উপহার পাওয়ার পর মুসলমানদের উচিত তা খুলে দেখা এবং সন্তোষ প্রকাশ করা; সম্ভব হলে দাওয়াত জানিয়ে, পত্রলিখে অথবা মৌখিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। উপহার দাতা উপস্থিত থাকলে তার জন্য দোয়া করা উচিত।

৭. কাউকে উপহার প্রদান এবং পরে তা ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলা ভদ্রতা নয়। অবশ্য পিতামাতার বা তাদের দাদা দাদীরা সন্তানকে উপহার দিয়ে ফেরত নিলে সেটা ভিন্ন কথা।

৮. উপহার পাওয়ার পর কোন এক উপলক্ষে বদলী উপহার দেওয়া সৌজন্য বিশেষ।

৯. কোন মুসলমান এমন কারো উপহার গ্রহণ করবে না, যে তার কাছ থেকে তার কর্তৃত্বের সুযোগ নিতে বা সুবিধা আদায় করতে চায় বা কোন উপায়ে প্রভাবিত করতে চায়। কার্যতঃ এ ধরনের উপহার বাস্তবিক পক্ষে ঘুষের শামিল।

১০. মদের বোতল বা শূকরের মাংসের ন্যায় নিষিদ্ধ জিনিস কোন মুসলমান উপহার হিসেবে নিতে পারে না।

১১. উপযুক্ত কোন কারণে উপহার নিতে না চাইলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে উপহার দাতার অপমানিত হওয়া যৌক্তিক নয়।

১২. সন্তানদের উপহার দানের ক্ষেত্রে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দেয়া চলবে না।

১৩. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, উপহার দেয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে, এটা বাধ্যতামূলক নয়। উপহার প্রদান করা প্রয়োজন, এটা বিশ্বাস করা ভুল। এ ধরনের ভুল জনগণের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ব্যাহত করতে পারে। বিশেষ করে যেসব লোক আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়, তারা উপহার দান এড়িয়ে যাবার জন্য দেখা সাক্ষাৎ করতে চাইবে না।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয় আচরণ

মসজিদে

১. মসজিদে যাবার কালে মুসলমানদের সর্বোত্তম এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হবে, আতর বা প্রসাধনী ব্যবহার করা প্রয়োজন। জুতো পরিচ্ছন্ন কিনা– সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে।

২. পিঁয়াজ বা রসুন খেলে তার দুর্গন্ধ দূর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মুসলমানের মসজিদে যাওয়া যথোচিত হবে না। কারণ এর দুর্গন্ধে অন্যের বিব্রত হওয়ার কারণ হতে পারে।

৩. তাড়াহুড়া না করে শান্তভাবে ও নীরবে মসজিদে প্রবেশ ও মুসল্লিদের সঙ্গে উপবেশন করা উচিত।

৪. মসজিদে প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি করা চলবেনা; ডান দিক থেকে প্রথমে প্রবেশ বা ত্যাগ করবে।

৫. মসজিদে প্রবেশ করতে হলে মুসলমানদের প্রথমে ডান পা ফেলে বলতে হবে "বিসমিল্লাহে আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা" (হে আল্লাহ, তোমার রহমতের দুয়ার আমার জন্য খুলে দাও)।

৬. মসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব।

৭. মসজিদে কথা বলা যেতে পারে, তবে নিম্নোক্ত বিধি মানতে হবে ঃ

   ক) মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা ঠিক নয়।

   খ) মসজিদে শান্তভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। নতুবা যারা নামাজ পড়ছে বা কুরআন পড়ছে তাদের অসুবিধা হবে।

   গ) মসজিদ কেনাবেচা অথবা অন্যবিধ খোদাবিমুখ ব্যক্তিগত আলোচনার স্থান নয়। সুতরাং যদি কাউকে দেখা যায় মসজিদে এ ধরনের আলোচনা করতে, তাহলে তাকে এ কাজে নিষেধ করতে হবে।

ঘ) মসজিদে যারা দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাদের পাশে বসা উচিত নয়।

৮. জামাতে নামাজ পড়ার শুরুতে নামাজিদেরকে সোজা লাইনে দাঁড়াতে হবে– প্রথমে পুরুষ, তারপর শিশু, তারপর স্ত্রীলোক। লাইন সোজা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পাশাপাশি সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

৯. ঋতুবতী মহিলা অথবা অপবিত্র অবস্থায় থাকা মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ অবৈধ নয়। তবে তাদেরকে মসজিদে অবস্থান করতে বারণ করা হয়েছে।

১০. মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর উত্তম স্থান। সুতরাং মুসলমানদের নিয়মিতভাবে সেখানে যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে মসজিদে যায়, সে উত্তম মুসলমান।

১১. নামাজরত কোন ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা অনুচিত। কেননা এর ফলে তার নামাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

১২. মসজিদ ত্যাগ করার সময় তাড়াহুড়া করা অনুচিত। মসজিদ ছেড়ে আসার সময় প্রথমে বাম পা ফেলতে হবে; বলতে হবে "আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক" (হে আল্লাহঃ আমি তোমার অনুগ্রহ চাই)।

১৩. জামাতের নামাজে মুসল্লিদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। ইমামের আগে আগে রুকু, সেজদায় যাওয়া বা ওঠা নিষেধ।

১৪. মসজিদের একই স্থানে মুসলমানদের নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা হয়নি।

১৫. মসজিদকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত।

কবরস্থানে

১. কবরস্থান জিয়ারত করার ব্যাপারে মুসলমানদের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। একটি হল মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, অপরটি কেয়ামতের ব্যাপারে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

২. কবর জিয়ারতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মহিলারাও কবর জিয়ারত করতে পারে। তবে তারা হরহামেশা কবর জিয়ারত করুক– এটা কাঙ্ক্ষিত নয়।

৩. কবর জিয়ারত কালে বলতে হবে "আসসালামু আলা আহলিদ দিয়ারী মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিন ওয়া ইয়ারহামুল্লাহ আল মুসতাকদিমিনা ইনশাআল্লাহ্ বিকুম লা-লাহিকুন" (কবরস্থানের মুসলমান ও ঈমানদার বান্দাদের উপর সালাম যারা আমাদের আগে ইহধাম ত্যাগ করেছেন এবং যারা পরে যাবেন তাদের উপর খোদার রহমত বর্ষিত হোক। খোদার শপথ, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব।
৪. কবরস্থানে ইসলামি বিধানের লংঘন নিষিদ্ধ।
৫. ৩ নম্বরে বর্ণিত মৃতের জন্য দোয়া করা ছাড়া কবরের উপর কোন কিছু বলা যাবেনা।
৬. কবর থেকে কোন প্রকার বরকত পাবার প্রত্যাশ্যায় সেটা স্পর্শ করা বা ছোঁয়া নিষিদ্ধ।
৭. কবরের উপর ফুল, পুষ্পমাল্য অর্পণ করা বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণ।
৮. কবরে মোমবাতি জ্বালানো বা লণ্ঠনবাতি স্থাপন গর্হিত কাজ।
৯. কবর জিয়ারত কালে মহিলাদের ইসলামি বিধান লংঘন করে অইসলামি পোশাক পরিধান অথবা বিলাপ করা নিষিদ্ধ।
১০. বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিতভাবে উপাসনার জন্য কবর কোন স্থান নয়। কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন ও আচরণে। কবরকে উপাসনার অথবা উৎসবের স্থানে পরিণত করা ইসলামে হারাম।
১১. কবরে বসা নিষিদ্ধ।
১২. কবর জিয়ারতের কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় নেই।

রাজপথে

সড়ক, রাজপথ ও গলি হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি। এসব স্থানে আচরণ বিধি মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেসব বিধান মেনে চলা প্রগতি ও সভ্যতার ইংগিতবাহী; এগুলোর লংঘন অনগ্রসরতার শামিল ঃ

১. সড়ক সংক্রান্ত ব্যক্তির আচরণের প্রধান নীতি হবে অন্যের ক্ষতি বা বিরক্তির কারণ এড়িয়ে যাওয়া।

২. সড়ক পরিষ্কার রাখা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

৩. সড়ক কোন বৈঠক বা বসার স্থান নয় এবং এজন্যে যাতায়াতের অসুবিধা করা উচিত নয়।

৪. ইসলামি রাষ্ট্রে সড়ক ও রাজপথে ইসলামের বিধান লংঘন করা খুবই মারাত্মক এবং সমাজে তার প্রভাব পড়ে। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে ঃ যদি সে এমন দেখতে পায়, যা আপত্তিকর তা বর্জন করা, তা করার পরামর্শ দিতে হবে; তবে শর্ত হচ্ছে ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও সদাচরণের সাথে তা করতে হবে এবং ইসলামি নীতির সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

৫. যারা ভুল পথে আছে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা, বৃদ্ধ অথবা পঙ্গু লোকদের সাহায্য করা ইসলামের অন্যতম কাজ এবং এতে সদাচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৬. সড়কে জনগণের জন্য ক্ষতিকর বা আক্রমণাত্মক অথবা বিরক্তিকর কিছু থাকলে তা অপসারণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যতম কর্তব্য।

৭. সড়কে দেখা পাওয়া বা সাক্ষাৎকারী কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা অনুচিত। মুসলমানদের অন্যদের ব্যাপারে সু-ধারণা থাকতে হবে।

৮. সড়কে স্বাগত সম্ভাষণের জবাব দেয়া সৌজন্যের শামিল।

৯. নারী পুরুষ সড়কে মিলেমিশে চলার অভ্যাস পরিহার করবে। মহিলারা সড়কের একপ্রান্ত দিয়ে চলাচল করবে।

১০. সড়কে মহিলাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর পুনরায় তাকানো নিষিদ্ধ। সুতরাং পুরুষকে হয় দৃষ্টি অবনত করতে হবে নতুবা অন্যদিকে চোখ ফেরাতে হবে।

১১. যাদের নিজস্ব যানবাহন নেই, তাদের গাড়িতে লিফট দেয়াও একটি ভাল কাজ।

১২. যানবাহনে চলাচলকালে নারী ও বৃদ্ধ লোকদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে।

১৩. জন পরিবহনে (Public Transport) যাতায়াতকালে মুসলমানদের প্রয়োজন হলেই কথা বলা উচিত এবং তা বলতে হবে নম্র সুরে। তাছাড়া

ধুমপান বা সহযোগী যাত্রীদের কাছে বিরক্তির কারণ হয় এমন কিছু করা অনুচিত।

১৪. জনপরিবহনে গাদাগাদি করা অথবা হুড়াহুড়ি করা সভ্য আচরণ নয়। যানবাহনে উঠা এবং নামার সময় যথার্থ ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হবে।

১৫. রাস্তায় পিছন দিক থেকে কাউকে চিৎকার করে ডাকা বদঅভ্যাস। কথা বলার আগে তার কাছে যাওয়া উচিত।

১৬. রাস্তা বা সড়কে চলাফেরাকালে আহার করা, পান চিবানো ও ধুমপান ইত্যাদি বাজে অভ্যাস।

১৭. রাস্তায় কোন মুসলমানের চলাফেরার ধরন তার ইসলামি ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। এটা অন্যের প্রতি এবং নিজের প্রতি কতিপয় মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। সুতরাং হাঁটা এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে কতিপয় নীতির সমন্বয় থাকতে হবে ঃ

ক) হাঁটার সময় হেলেদুলে বা নাচনতুলে হাঁটা উচিত নয়। একইভাবে মেয়েলী স্বভাবে বা গর্বভরে দু'পা তুলে চলা, অথবা জড়সড় লাজনম্র হয়ে চলা পরিহার করতে হবে।

খ) একত্রে চলার সময় অন্যের কথা বিবেচনা করে খুব দ্রুত হাঁটা উচিত নয়।

মৃতের দাফন কাফন

কারো মৃত্যু হলে করণীয়

১. কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে এ খবর স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব ও জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।* তবে এ ধরনের ঘোষণায় মৃত ব্যক্তির প্রশংসা বা সাফল্য বর্ণনা করা উচিত নয়। বরং ঘোষণায় মৃত ব্যক্তির জন্য সকলকে দোয়া করার আহ্বান জানাতে হবে।

২. গোসল এবং কাফনের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিতে হবে। মিতব্যয়িতার সাথে একাজ সম্পাদন করতে হবে।

৩. পুরুষের মৃত দেহ পুরুষ এবং নারীর মৃত দেহ নারী গোসল করাবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে জীবিত জন মৃতের গোসল করাবে।

৪. মৃত ব্যক্তিকে পানি দিয়ে এবং সম্ভব হলে জলপদ্ম (Lotus leave) দিয়ে বেজোড় সংখ্যাং ২, ৫ বা আরো বেশিবার গোসল করাবে এবং ডান দিক থেকে গোসল শুরু করাবে। সর্বশেষ গোসলের সময় কর্পূর দেয়া যেতে পারে। মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার চুল তিনটি বিনুনি করে মাথার পিছনে রেখে দিতে হবে।

৫. মৃতের কাফনের কাপড় সাধারণ মানের হওয়া উচিত এবং বাহুল্য ব্যয় এক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয়। স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া ‘কফিন’ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।[১]

---

* এদেশে ছোট শহর ও পল্লী এলাকায় সংবাদপত্র না থাকায় সাধারণতঃ মাইকের সাহায্যে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা যায়– অনুবাদক।

১. ‘কফিন’ অর্থ আরবি নয় বরং শব্দটি ইংরেজি অর্থ প্রকাশ করেছে অর্থাৎ দাফনের আগে লাশ রাখার জন্য বাক্স বা খাঁচার ব্যবহার প্রসঙ্গ।

৬. শহীদের মর্যাদাসম্পন্ন লাশের ক্ষেত্রে তাদের শরীর থেকে অলংকার খুলে ফেলতে হবে এবং রক্ত সম্বলিত কাপড় চোপড়েই (না ধুয়ে) দাফন করতে হবে।

৭. পবিত্র হজ্ব বা উমরাহ্ পালনকালে কোন মুসলমানের মৃত্যু হলে তার দেহ সম্ভব হলে পানি ও জলপদ্ম দিয়ে গোসল করাতে হবে এবং যে দু'খণ্ড কাপড় পরে তিনি হজ্ব বা উমরাহ্ পালন করছিলেন তা দিয়েই দাফন করাতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার সুগন্ধী বা আতর মৃতদেহে লাগানোর প্রয়োজন্ নেই বা মাথাও ঢাকতে হবেনা।*

৮. যে ব্যক্তি মৃতদেহ গোসল করিয়েছে তার গোসল করা উচিত এবং যারা লাশ বহন করবে তাদের অজু করা উচিত।

৯. যারা মৃতদেহ গোসল করাবে তারা মৃত ব্যক্তির কোন প্রকার শারীরিক অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে থাকলে তা অন্যদের কাছে বলবে না। ভাল দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১০. মৃতদেহ গোসল ও কাফনের কাপড় পরানোর পর বিলম্ব না করে জানাজার নামাজ পড়ে কবর দেয়ার তাগিদ করা হয়েছে।

দাফন কাজে অনুগমন

১. কোন মুসলমানের দাফনে অবশ্যই অন্যান্য মুসলমানের যোগ দেয়া উচিত। সুতরাং মৃত ব্যক্তি বা তার আত্মীয়-স্বজন সরাসরি পরিচিত হোক বা না হোক দাফন কাফনের মিছিলে যোগ দিতে কোন মুসলমানের বিলম্ব করা উচিত নয়।

২. দাফন কাজে যোগদানের বিষয়টি দু'টি পর্যায়ে বিভক্তঃ প্রথম পর্যায় জানাজার নামাজ পড়া পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায় মৃত ব্যক্তির দাফন পর্যন্ত। যারা প্রথম পর্যায়ে যোগ দেবেন তাদের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।

৩. শিশুসহ মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক মুসলমানের জানাজা পড়তে হবে। জানাজার

---

* মালিকি ও হানাফি মতে ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সমর্থন করেনা।

জন্য লাশ মসজিদে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। মসজিদের বাইরে অথবা মসজিদের প্রাঙ্গণে জানাজার নামাজ পড়তে হবে।

৪. জানাজায় কেউ কেউ বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা অন্যদের আসার জন্য প্রতীক্ষা না করে জানাজায় অংশ নেয়া উচিত।

৫. দাফন যাত্রার গতি খুব দ্রুত হওয়া উচিত নয়।

৬. দাফন কাজে যারা পদব্রজে অনুগমন করবে তারা কফিনের সামনে বা পিছনে অথবা ডানে বা বামে থেকে হাঁটবে। যারা ঘোড়ায় চড়ে বা গাড়িতে যাবে তারা পিছনে চলবে।

৭. লাশের অনুগমনকালে ধুপ-ধুন বা মোমবাতি নেয়া, জোরে বা উচ্চস্বরে 'আল্লাহ' বলা, সশব্দে কাঁদা বা জোরে শোরে কোরআন পড়া নিষিদ্ধ।

৮. দাফনের মিছিলের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

৯. লাশের কোন মিছিল দেখলে মুসলমানদের উচিত দাঁড়িয়ে যাওয়া।

১০. কবরস্থান দূরে না হলে লাশের কফিন গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

১১. যারা লাশ বহন করবে তাদের অজু করা উচিত। এর ফলে তারা শারীরিকভাবে এবং আবেগপ্রবণতার দিক থেকে সতেজ থাকবে।

১২. দাফন মিছিলে অনুগমনকালে কবরস্থান দূরে না হলে গাড়িতে যাওয়ার চাইতে হেঁটে যাওয়াই ভাল। দাফনের পর ফিরে আসার সময় গাড়িতে আসা যেতে পারে।

দাফন

১. মুসলমানদের একান্তভাবে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ কবরস্থান সংরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অমুসলমানদের কবরস্থানে মুসলানদের দাফন না করা এবং মুসলিম কবরস্থানেও অনুরূপ বিধান করা অতীব জরুরি।

২. কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর বিশেষভাবে অনুরোধ করে হলেও তার লাশ পুড়িয়ে ফেলা যাবে না। এ ধরনের অনুরোধ কখনই পূরণ করা চলবে না।

৩. শহীদান (যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কারণে নিহত হয়ে শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত) ছাড়া অন্যান্যদেরকে কবরস্থানে দাফন করতে হবে। শহীদদেরকে তাদের শাহাদাতস্থলে দাফন করতে হবে।

৪. যে পাড়ায় বা মহল্লায় ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সেখানেই তাকে দাফন করা উচিত। মৃত ব্যক্তির নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া অথবা অন্য শহরে স্থানান্তরিত করা বাঞ্ছিত নয়।

৫. নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ছাড়া মৃত্যুর পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন সম্পন্ন করতে হবে ঃ

(ক) রাতে

(খ) সূর্যোদয় থেকে সূর্য-দিগন্তে ৪.৫ ডিগ্রি না উঠা পর্যন্ত (পুরোপুরি সূর্য উঠা পর্যন্ত)।

(গ) মধ্যাহ্নগগনে সূর্যের অবস্থান কালে (সূর্য যখন মধ্য রেখায় অবস্থান করে) তার মধ্যরেখা অতিক্রম করা পর্যন্ত

(ঘ) সূর্যাস্তের আগে যে সময় সূর্যের রশ্মি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে পুরোপুরি সূর্যাস্ত পর্যন্ত। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এ সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দাফন করা নিষিদ্ধ।

৬. রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অথবা ধনীদের জন্য বিশেষ কবরস্থান নির্বাচন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম জীবনে ও মরণে শ্রেণীভেদ প্রত্যাখ্যান করেছে।

৭. যুদ্ধকালে বা মহামারীর সময় একই কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করতে হলে জীবিতকালে যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে, তাকেই আগে দাফন করতে হবে।

৮. শুধু পুরুষ লোকেরাই মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করবে। মৃতের পুরুষ আত্মীয়রাই সত্যিকার অর্থে তাকে (নারী হোক বা পুরুষ হোক) কবরে নামানোর হকদার।

৯. মৃতের গোসল, কাফন পরানো বা কবরে নামানোর কাজে ভাড়াটে লোক নিয়োগ করা অনুচিত। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও পরিবারকে এসব কাজ সম্পাদন করতে হবে। জীবনে ও মরণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্কের উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১০. মৃতকে কিবলামুখী করে ডানদিকে কবরে শুইয়ে দিতে হবে।

১১. মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপনকারীরা বলবে ঃ “বিসমিল্লাহে ওয়াআলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহে” (আল্লাহর নামে এবং তার রহমতে ও রাসূলুল্লাহর (সা.) সুন্নাহর অনুসরণে); কবরের পিছন দিক হতে লাশ কবরে স্থাপন করতে হবে।

১২. কবরস্থানে লাশ স্থাপন করা পর্যন্ত কবরে দাঁড়িয়ে থাকার প্রযোজন নেই। যারা কবরে লাশ স্থাপন করবে তারা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনরা বসে থাকতে পারবে।

১৩. কবরে লাশ নামানোর পর এবং তার উপর ঢাকনা দেওয়ার পর কবরের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন তিন মুঠি মাটি কবরে স্থাপন করবে।

১৪. মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির তওবা করানো একটি নব্য রেওয়াজ। ব্যক্তির মৃত্যুর আগে তওবা করাতে হবে।

১৫. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা সুন্নত।

কবর দেওয়ার পর

১. মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনের উচিত তার ঋণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিশোধ করা, অবশ্য যদি তা তাদের সামর্থ্যে কুলায়।

২. ইসলামি শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হলে মৃত ব্যক্তির সর্বশেষ ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম যেহেতু নির্দিষ্ট লোকদের জন্য উত্তরাধিকার আইন কার্যকর করেছে, সেহেতু মৃত ব্যক্তি তার কোন উত্তরাধিকারীকে অতিরিক্ত অর্থ দেয়ার ওছিয়ত করলে তা পূরণ করা ঠিক হবেনা।

শোক প্রকাশ

১. শোকসন্তপ্তদের সান্ত্বনা, সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ মুসলমানদের অন্যতম কর্তব্য। এর ফলে মুসলিম সমাজে সম্প্রীতির সম্পর্ক জোরদার হয়। সুতরাং মৃত্যুর পর শোকাহত পরিবারের সঙ্গে সামাজিকভাবে

মেলামেশা করা, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা ইসলামি আচরণের বৈশিষ্ট্য।

২. কারো প্রতি সমবেদনা প্রকাশের ভাষা খুব সতর্কভাবে চয়ন করতে হবে। খোদার ইচ্ছাকে মেনে নিতে উৎসাহিত করা এবং সহানুভূতি প্রকাশের জন্য যথার্থ শব্দ চয়ন করতে হবে।

৩. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমবেদনা প্রকাশের ইসলামি ভাষা হচ্ছে ঃ গফরাল্লাহু লিমাইয়াতিকুম (হে খোদা মৃতের গোনাহ মাফ কর) এবং ইন্নালিল্লাহি মা আখাযা ওয়ালাহু মা'আতা ওয়াকুল্লু শাইয়িন ইন্দাহু ইলা আজালীন মুসাম্মা (খোদা যা নিয়েছেন বা দিয়েছেন তা প্রকৃত অর্থে তারই এবং প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁর নির্দিষ্ট সময় রয়েছে)।

৪. শোকাহত লোকদের সান্ত্বনা ও উৎসাহদান যতদূর প্রয়োজন হয় দিতে হবে। শোকাহত সদস্যদের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতে হবে।

৫. শোকসন্তপ্ত পরিবার আগত লোকজনদের জন্য রান্নাবান্না করতে বা খাদ্য পরিবেশন করতে পারেনা। বরং বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্য তৈরির জন্য; কারণ পরিবারের সকলে প্রিয়জন হারানোর বেদনায় থাকে আচ্ছন্ন।

৬. শোকবিধুর লোকজনকে সমবেদনা জানানো সদাচরণ সন্দেহ নেই, তবে এতে বাড়াবাড়ি করা চলবে না। বক্তৃতা হবে সংক্ষিপ্ত। হালকা কথাবার্তা, রসিকতা এবং হাসাহাসির মত বিষয় পরিহার করতে হবে।

৭. কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর সবরকম বিদয়াত কাজ (যেমন চতুর্দশ দিবসে কবরের পাশে বসে সারারাত ধরে বিলাপ করা ইত্যাদি) পরিহার করতে হবে।

শোক পালন

১. ইসলামে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার অনুমতি থাকলেও এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমানকালে মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

২. মৃত আত্মীয়ের জন্য মহিলাদের তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করতে নেই। বিধবারা চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারে।

৩. ক্ষতির পরিমাণ যত বেশিই হোকনা কেন, কারো দৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে গেছে, এমন হওয়া চলবেনা। শোকাহত লোকদের সংযম প্রদর্শন করতে হবে এবং খোদার শোকর করে তাদেরকে বলতে হবে, "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলায়হি রাজেউন" (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব)

৪. আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাহত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। মৃতদের জন্য বিলাপ করতে দেখা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং ইসলামে তা অনুমোদিত। ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হচ্ছে বুক চাপড়ে, চুল বা কাপড় ছিঁড়ে বিলাপ করা বা তীক্ষ্ণ চীৎকার করা।

৫. মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ কালে ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী কোন বাক্য যাতে উচ্চারিত না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে; যেমন– "আমার এখন কি উপায় হবে"? অথবা "আমাদের এখন ভরণ পোষণকারী চলে গেল"। এসবের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত মানুষের উপর নির্ভর করা।

৬. মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছেঃ শোক প্রকাশকারীদের এভাবে শোক প্রকাশ করতে মানা করা।

৭. ইসলামের মতে, বিধবাদের শোক প্রকাশকাল পর্যন্ত বিয়ে করা উচিত নয়। সুতরাং এ সময়ের মধ্যে বিধবার প্রতি বিয়ের প্রস্তাব দেয়া অভদ্রতা।

৮. শোক প্রকাশরত মহিলার জাফরান রঙের কাপড়, অলঙ্কার না পরলে, চুলে মেহেদী বা চোখে আতর না লাগালে ভাল হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা দাফন কাফনের ব্যাপারে খুবই সাধারণ ও প্রয়োজনীয় বিধান আলোচনায় সীমিত থেকেছি। যারা এ ব্যাপারে আরো তথ্য চান, তাদেরকে ইসলামি আইনের বিভিন্ন গ্রন্থাদি পড়াশুনা করতে হবে।

কবরস্থানের স্থাপত্য

কবরের স্থান

১. শহর ও গ্রাম থেকে দূরে অবস্থিত কবরসমূহে জেয়ারত করা দুরুহ হয়ে পড়ে।

২. কবরস্থানসমূহ শহর থেকে যুক্তিসংগতভাবেই নিকটবর্তী হতে হবে। শহর সম্প্রসারণের সাথে সাথে এগুলো শহরের অংশে পরিণত হতে পারে এবং মৃতদেহগুলো মাটির সাথে মিশে গিয়ে থাকলে প্রয়োজনবোধে নির্মাণ কাজ, বৃক্ষরোপণ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এই নীতি স্মরণ রাখতে হবে যে, মৃত দেহের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা না করেই এই ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. জীবিত ও মৃতদের জন্য ইসলাম পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য কবরস্থান পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

কবরের আভ্যন্তরীণ ডিজাইন

১. মৃত্যুর আগেই কবর খনন করা কারো জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়।

২. কবর অবশ্যই গভীর করে খুঁড়তে হবে এবং তা প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।

৩. দু'ধরনের কবর খোঁড়ার অনুমতি রয়েছে, তবে প্রথম পদ্ধতির অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। প্রথমটি হচ্ছেঃ কবরের পাশে কিবলামুখী করে ছোট গর্ত করা। দ্বিতীয়টিঃ কবরের মাঝখানে ঢালু করে খনন করা।

কবরের বাইরের ডিজাইন

১. ইসলামে কবর ও কবরস্থান নির্মাণে এমন এক অনন্য স্টাইল রয়েছে, যা বিনয়, মিতব্যয়িতা ও বাহুল্যবর্জনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এতে সৌধ তৈরি করে মৃতকে গৌরবান্বিত করার অবকাশ নেই।

২. কবরের উচ্চতা হবে ভূমিস্তর থেকে এক হাতের মত উঁচু। এর ফলে কবর চিহ্নিত রাখা ও সংরক্ষণ করার মত পার্থক্য হয়।

৩. লাশ দাফনের পর উত্তোলিত মাটির চেয়ে কবরকে বেশি উঁচু করা যাবেনা।

৪. কবরের উপর কোন ধরনের নির্মাণ কাজ করা চলবে না। তবে কাদামাটির সাহায্যে কবরগাহকে অনুমোদিত সীমার মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উঁচু করা যেতে পারে, যাতে করে বায়ু বা বৃষ্টির ফলে তার ক্ষতি না হয়; নিঃসন্দেহে এ কাজটি অনুমোদনযোগ্য; কারণ এতে একটি লক্ষ্য রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অথবা কারুকার্য খচিত করার বা অন্য কোন প্রকার গর্ব প্রকাশের লক্ষ্য কাম্য নয়।

৫. কবরের উপর বৈশিষ্ট্যময় নামফলক বসানো নিষিদ্ধ।

৬. জিপসাম, পেইন্ট দ্বারা কবর প্লাস্টার করা অথবা এধরনের ডেকোরেশন বড়ই বেমানান; কেননা মৃতদেহ মাটিতে মিশে যাবে।

৭. মৃতের নাম ছাড়া কবরের উপর আর কোনকিছুই লেখা যাবেনা এবং এটাও হবে চিহ্নিতকরণের জন্য, কারুকার্যময়তার জন্যে নয়।

উনবিংশ অধ্যায়

সফর

সফর বা ভ্রমণ সহজ কাজ নয়; বরং তা কষ্টসহিষ্ণু ও প্রায়শ জটিল। এজন্য সফরকে যতদূর সম্ভব হালকা ও উপভোগ্য করে তোলার জন্য ইসলাম কতিপয় বিধি প্রণয়ন করেছে ঃ

১. সফরের আগে মুসলিমকে দু'রাকাত (ইস্তিখারার) নামাজ পড়া উচিত এবং খোদার কাছে সুষ্ঠু নির্দেশনা চাওয়া আবশ্যক।

২. কোন কোন ব্যক্তি তার কোন আত্মীয় সফরে গেলে এমন সব কুসংস্কার ও বিশ্বাস পালন করে (যেমন ঐ ব্যক্তির গৃহত্যাগের পর পরই তার ক্ষতি হতে পারে ভেবে, বাড়িঘর পরিস্কার না করা) যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ ইসলাম সব রকম কুসংস্কারের বিরোধী।

৩. কোন মুসলমান সফরের আগে তার প্রতিকূল কোন চিহ্ন বা প্রতীক দেখেছে বলে মনে করে সফর থেকে বিরত থাকবে না।

৪. সফরকালে সাথি নেয়া প্রয়োজন এবং একা সফর পরিহার করা দরকার।

৫. দিনের শুরুতে সফর শুরু করা শ্রেয় এবং সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার যাত্রা শুরু করা।

৬. যে কোন দিন ও সময়ে সফর শুরু করা যেতে পারে। শুক্রবার সফর না করা সংক্রান্ত ধারণা ইসলামের বিধানসম্মত নয়।

৭. চার ব্যক্তির সমন্বয়ে আদর্শ সফরকারী দল হয়ে থাকে।

৮. সফরে বের হলে অথবা যানবাহনে আরোহণের আগে মুসলমানদের এই দোয়া পড়া উত্তমঃ "সুবহানাল্লাজী সাখখারা লানা হাজা ওয়া মা কুন্না লাহু মাকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বীনা লা মুনকালিবীন" (তিনিই সকল গৌরবের মালিক, যিনি এই বাহনকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আমাদের পক্ষে একে বাগে আনা সম্ভব ছিলনা এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব)।

৯. সফরকারীর সাথে বিদায় বেলায় করমর্দনকালে মুসলমানদের বলা উচিতঃ "আস্তাজাল্লাহ্ দিনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা" (খোদা তোমার ঈমান, ধর্মীয় দায়িত্ব এবং শেষ পর্যন্ত তোমার কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ দাও)।

১০. কোন গ্রুপে তিনের অধিক ব্যক্তি সফর করলে এই সফর আয়োজনের জন্য একজনকে নেতা নির্বাচন করতে হবে।

১১. সফরে অংশগ্রহণকারী সকলকে নেতার কথা শুনতে ও মানতে হবে। তার প্রতি অবাধ্যতা ও মতানৈক্যের ফলে তর্কবিতর্কসহ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

১২. কোন মুসলমানের একাধিক স্ত্রী থাকলে, সফরে কোন্ স্ত্রী যাবেন, তা নির্ধারণের একমাত্র পথ হলো লটারি করা।

১৩. হজ্ব বা উমরাহ পালনকালেও ১২ নম্বরে বর্ণিত নিয়ম পালন করতে হবে।

১৪. কোন মুসলমান যদি এমন দেশ সফরে বের হয়, যেখানে পবিত্র কুরআনের অসম্মান হতে পারে, সেক্ষেত্রে কুরআন বা তার অংশবিশেষ সঙ্গে নেয়া বাঞ্ছনীয় হবেনা।

১৫. মহরম পুরুষ বা স্বামী ছাড়া দীর্ঘপথ সফরে মহিলাদের বের হওয়া অনুচিত।

১৬. সফরসঙ্গীর প্রতি সদয়, সহায়ক, ভদ্র ও সহযোগিতার মনোভাব রাখতে হবে। অন্যের সেবা করা এবং সকল কাজ ভাগ করে অংশ নেওয়া উচিত।

১৭. সফরসঙ্গীদের কেউ পীড়িত হয়ে পড়লে সঙ্গীদের উচিত তার পরিচর্যা করা।

১৮. যারা বিভিন্ন দেশ সফর করে তারা ফিরে এসে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধদের উপহার দেবেন– এই প্রত্যাশা ভ্রমণকে আরো জটিল ও ব্যয়বহুল করে তোলে।

১৯. সফর দূর পাল্লার হলে সফরকারীর প্রতি পরামর্শ হলো কষ্টকর অতিরিক্ত সফর না করা; বরং যখনই সুযোগ আসবে বিশ্রাম নিতে হবে।

২০. কোন কারণে থেমে গেলে সফরকারীর কর্তব্য হচ্ছে ঃ সড়কে তার যানবাহন পার্ক না করা অথবা সড়কের অংশবিশেষ দখল না করা; কারণ

এর ফলে যান চলাচল ব্যাহত হতে পারে এবং অন্যদের জীবন ও মাল বিপন্ন হতে পারে।

২১. বাইরে থেমে গেলে অথবা ঘুমাতে গেলে, সফরকারীকে বিশেষ করে রাতের বেলায় যেখানে ক্ষতিকর প্রাণী থাকে, এমন স্থান এড়িয়ে যেতে হবে।

২২. সফরকারীরা কোন কারণে থামলে বা বিশ্রাম নিতে চাইলে তাদের উচিত বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত না হওয়া অথবা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া বরং এক গ্রুপে চলাফেরা করা।

২৩. সফরকালে এমন লোকদের সাক্ষাৎ পেলে, যাদেরকে সাহায্য করা উচিত, এবং সেক্ষেত্রে মুসলিম পর্যটকের কর্তব্য হচ্ছে ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাহায্যকামী যেই হোক না কেন, তাদেরকে পানি বা জ্বালানী দান করে, যানবাহন মেরামত করে, বা লিফট দিয়ে অথবা সম্ভাব্য অন্য যেকোন প্রকারে সহায়তা করা।

২৪. রমজান মাসে সফরে গেলে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। কোন মুসলমান সফরকালে রোজা রাখতে সক্ষম হলে রোজা রাখতে পারে– না হলে সে রোজা ছাড়তেও পারে।

২৫. পর্যটকের সুবিধার জন্য জোহর ও আছর নামাজ একত্রে এবং মাগরিব এবং এশার নামাজ একত্রে পড়তে পারে।

২৬. সফরকালে যেদিকেই সফর করা হোকনা কেন, মুসলমান তার যানবাহন বা জন্তুর উপরে থেকেও নামাজ পড়তে পারে।

২৭. সফরকালে চার রাকাত নামাজের দু'রাকাত (কসরের নামাজ) পড়তে হয়।

২৮. সফরকারীর উচিত সফরের জন্য রাতের বেলার সদ্ব্যবহার করা।

২৯. সফরের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হওয়ার পর বিশেষতঃ হজ্বের পর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসলমানদের গৃহে ফিরে আসা উচিত।

৩০. ভ্রমণ শেষে রাতে বাড়ি ফেরা পরিহার করা উচিত।

৩১. নিজ শহরে ফেরার পর মুসলমানের কাজ হলো স্থানীয় মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়া।

৩২. সফরকারী ফিরে আসার পর তাকে কোলাকুলি করে স্বাগত জানানো উচিত। পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলার সাথে কোলাকুলি করবে।

৩৩. গ্রাম, শহর বা আবাসিক এলাকায় প্রত্যাবর্তনের মুখে পর্যটককে এই বলে দোয়া করতে হবে ঃ "আউজোবি কালিমতিআল্লাতি তাম্মাতি মিন শাররী মা খালাক" (আল্লাহর সৃষ্ট ক্ষতিকর জিনিস হতে আমি পানাহ চাই)।

৩৪. সফরকালে দোয়া পড়া যায়। কার্যতঃ সফরকারীর দোয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে এবাদত অর্থে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলা হচ্ছে না বরং খোদাকে স্বতঃস্ফূর্ত স্মরণ, তার কাছে পরিপূর্ণতা, নির্দেশনা ও সাহায্যের জন্য মোনাজাত করা।

৩৫. যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান) এবং অবতরণকালে সুবহানাল্লাহু বলা উচিত।

৩৬. সফরকারীর অন্যতম সদাচরণ হচ্ছে ঃ তার সঙ্গীর ভুলত্রুটি উপেক্ষা করা ও ভুলে যাওয়া, খোশালাপ করা, তাদের সাথে পানাহার করা এবং বিতর্ক এড়িয়ে চলা।

৩৭. কোন জন্তুর পিঠে চড়ে ভ্রমণকালে যদি এমন কোন এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ঘাস ও পানি রয়েছে, সফরকারীকে তখন ধীরে অগ্রসর হতে হবে, অনুর্বর বা মরুভূমির মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

৩৮. মুসলমানদের মুসলিম বিদ্বেষী দেশে যাওয়া এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করা যথার্থ নয়। কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিম দেশে সফর করতে চায়, তাহলে তার উপযুক্ত কারণ বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

বিংশ অধ্যায়

ক্রীড়া

১. খেলাধুলা দেখার ব্যাপারে আসক্ত হয়ে পড়া সময়ের অপচয় মাত্র এবং কোন মুসলমানের জন্য এতে খুব কমই সুবিধা থাকতে পারে। ইসলামে বলবান, স্বাস্থ্যবান ও শরীর গঠনের মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। খেলাধুলা অবশ্যই একটি মাধ্যম এবং তা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। খেলাধুলা যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা নিষিদ্ধ। শরীরচর্চা শিক্ষার প্রশিক্ষক বা প্রশিক্ষণদাতার ক্ষেত্রে অবশ্য এটা প্রযোজ্য নয়।

২. উপরে উল্লিখিত আলোচনার আলোকে ইসলামি পোশাক বিধির আওতায় খেলাধুলার পোশাকের ডিজাইনও তৈরি করতে হবে।

৩. উট, ঘোড়া বা হাতির দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন দৌড় বা ইভেন্টের ফলাফলের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। যারা প্রতিযোগী নন তাদের ক্ষেত্রে যেকোন প্রকার বাজি বা জুয়া ধরা নিষিদ্ধ।

৪. আধুনিক কুস্তি বা মুষ্টিযুদ্ধের ন্যায় জীবন বিপন্নকারী সবরকম খেলাধুলা ইসলাম অনুমোদন করে না।

৫. ষাঁড়ের যুদ্ধ বা মোরগ লড়াইয়ের ন্যায় যেসকল ক্রীড়ায় জীবজন্তুর ক্ষতি হয়, সেগুলো নিষিদ্ধ; কেননা এগুলো ইসলামের মানবিক দাবির বিরোধী।

৬. ইসলামে যেসব খেলাধুলার প্রতি বেশি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো শুটিং বা থ্রোইং এর ন্যায় প্রক্ষেপণ জাতীয় খেলা।

একবিংশ অধ্যায়

জীবজন্তুর প্রতি আচরণ

১. জীবজন্তুর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দয়া ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করতে হবে।

২. জীবজন্তুর শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাদের উপর বোঝা চাপানো ন্যায়সঙ্গত।

৩. জবাই করার জন্য নির্ধারিত জীবজন্তুকে সতর্কতার সাথে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে তাদের প্রতি কোন প্রকার নির্যাতন করা না হয়।

৪. সফর বিধির অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে, জীবজন্তুর উপর আরোহণ করে ঘাস ও পানির এলাকা দিয়ে অতিক্রমকালে সফরকারীকে ধীর গতিতে যেতে হবে। আবার অনুর্বর বা মরুভূমি এলাকা দিয়ে যাবার কালে দ্রুত চলে যেতে হবে।

৫. অপ্রয়োজনীয় অথচ অক্ষতিকর প্রাণী বা পতঙ্গ যেমন কীট বা ছোট পাখী হত্যা না করাই ভাল।

৬. দুধ বা ডিম উৎপাদনকারী প্রাণী জবাই যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে।

৭. জীবজন্তুর খাসি করা বা প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

৮. মৌমাছি, পিঁপড়া, ব্যাঙ প্রভৃতি ক্ষতিকর না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের প্রাণী হত্যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

৯. নিম্নোক্ত চার শ্রেণীর প্রাণী হত্যার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হওয়া চলবেনা– বৃশ্চিক, ইঁদুর, সাপ ও টোৎঠেং।

১০. কুসংস্কারবশতঃ সাপ হত্যা থেকে বিরত থাকা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

১১. খচ্চর উৎপাদনের জন্য ঘোড়া ও গাধার মিলন ঘটানো পরিহার করতে হবে।

১২. জন্তুর জীন বা লাগামে অথবা কুকুরের গলায় সোনা-রূপার ব্যবহার অথবা রেশম দিয়ে প্রাণী সাজানো নিষিদ্ধ; কারণ এগুলো অর্থের অপচয় মাত্র এবং এতে গর্ব ও অহংকার প্রদর্শিত হয়।

১৩. কোন জন্তুর মুখে উত্তপ্ত লোহার দাগ দেওয়া নিষিদ্ধ। জন্তুর দেহের অন্যান্য অংশে দাগ দেওয়া যেতে পারে, তবে তার কোন ক্ষতি করা চলবেনা এবং দাগ দেওয়া প্রয়োজনীয় স্থানেই সীমিত রাখতে হবে।

১৪. জন্তুকে প্রহারকালে মুখে আঘাত করা ঠিক নয়।

১৫. শুধু তামাসা বা অন্য কোন কারণে মোরগ, ষাঁড় বা ভেড়ার ন্যায় প্রাণীদের একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটা নিষ্ঠুর কাজ হিসেবে বিবেচিত।

১৬. এমন জন্তু বেচাকেনা করা যাবেনা, যার এখনও তার মায়ের সহায়তা প্রয়োজন। এ ধরনের লেনদেন ইতোমধ্যেই হয়ে থাকলে, তা বাতিল করতে হবে।

১৭. পাখি ও প্রাণী শিকার কালে মায়ের উপর নির্ভরশীল তরুণ জীবজন্তু শিকার না করাই উচিত। অনুরূপভাবে যে জন্তুর বাচ্চা বা শাবক রয়েছে, সেগুলোর শিকার এড়িয়ে যাওয়া উত্তম; কেননা তার বাচ্চাটি তখন মারা যাবে।

১৮. হজ্ব বা উমরাহ্ করা কালে জীবজন্তু শিকার নিষিদ্ধ। হজ্ব বা উমরাহ্কালে কোন মুসলিম যদি জীবজন্তু বা প্রাণী শিকার বা হত্যা করে, তাহলে তার কাফফারা আদায় করতে হবে।

১৯. ময়লা আবর্জনা খেয়ে যেসব জীবজন্তু বেঁচে থাকে, সেগুলোর গোশত না খাওয়া উচিত এবং সেগুলোর উপর আরোহণ করা উচিত নয়। এসব জীবজন্তুকে খাঁচায় আবদ্ধ করে বেশ কিছুদিন পরিচ্ছন্ন খাবার না দেওয়া পর্যন্ত তাদের দুধ ব্যবহার করা যাবে না।

২০. কোন মুসলমানের গবাদিপশু, পাখি বা প্রাণী থাকলে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে তাদের খাবার দেওয়া ও পরিচর্যা করতে হবে।

২১. বন্দুক বা তীরের সাহায্যে শুটিং এ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাণীর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

২২. গাধার ডাক শুনে সমূহ অকল্যাণ থেকে খোদার কাছে আশ্রয় চাওয়া প্রয়োজন।

২৩. পোষা মোরগের ডাক শুনে মুসলমানদের উচিত খোদার রহমত কামনা করা।

২৪. দুগ্ধ দোহন, আহরণ প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ লক্ষ্যে যে সব জীবজন্তুর সৃষ্টি, সেইগুলোকে সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে।

২৫. মৃত জন্তুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ।

২৬. জন্তুকে অভিশাপ দেওয়া উচিত নয়।

২৭. জন্তু দুই প্রকার ঃ পরিষ্কার ও অপরিষ্কার। কুকুর ও শূকর হচ্ছে অপরিষ্কার জন্তু। এজন্য কুকুর কোন পাত্রের পানি পান করলে সেটা মাটি দিয়ে বার বার ঘষতে হবে।

২৮. দু'টি কারণ ছাড়া মুসলমানদের কুকুর পালন করা উচিত নয় ঃ

ক) প্রহরী কুকুর।

খ) শিকারী কুকুর। এ ধরনের কুকুর বাড়ির ভেতরে নয়, বাইরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

দি হোলি কুরআন, M.M. Pickthall অনুদিত (নিউইয়র্ক, ১৯৭৭)

আল-আলবানি, নাসির-আলদীন, *আদাব আল-জাফাফ* (বৈরুত, ১৯৭৭), *মানাসিক আল-হজ্ব ওয়া আল উমরাহ* (বৈরুত, ১৯৭৯), মুখতাসার সহীহ আল বুখারী (বৈরুত, ১৯৮১), *হিজাব আল মার'আল মুসলিম ফি আল কিতাব ওয়া আল সুন্নাহ* (বৈরুত, ১৯৮০)।

আল-গাজালী, *আল আদাব ফি আল দীন* (বৈরুত, ১৯৮০)

Hamaidullah, Mohammad, *Introduction to Islam* (Damascus, 1977),

ইবনে কাইয়ুম আল-জাওজিয়াহ, *তুহফাত আল মওলুদ* (দামেস্ক, ১৯৭১)

Murdock, G. P. *Social Structure* (New York, 1949).

Al- Nawawi, *Al-Nawawi's Forty Hadith* (Damascus, 1979); Al-Adhkar (Damascus, 1971).

Qutb , Sayyid, *Milestone* (I.I.F.So, 1977)

Qutb, Muhammad, *Islam the Misunderstood Religion* (Damascus, 1977).

Sakr, A.H.Pork : *Possible Reasons for its Prohibition* (Published by the author, 1975).

Sumner. W.G. *Folkways* (New York. 1965)

তাবরিজি, আল খতিব, *মিশকাত আল-মাসাবিহ,*

James Robson কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত (লাহোর, ১৯৮১)।

Vanderbilt, Amy, *The World Book Encyclopaedia* (Chicago, 1972)

Academic American Encyclopaedia (Danbury, 1942)

Encyclopaedia American (Danbury, 1982)

Encyclopaedia Britannica (London,1971)

Enclopaedia of Islam (London, 1960)

Enclycopaedia of Social Science (London,1962).

নির্ঘন্ট

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

ড. মারওয়ান ইব্রাহিম আল কায়সি ১৯৫০ সালে জর্দানের ইরবিদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আম্মানের শরীয়া কলেজ, মরোক্কোর আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি আম্মানে ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি কোপেনহেগেনে এক বছরের জন্য ইসলামি সংস্কৃতি কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি ইরবিদে ইয়ারমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি সংস্কৃতির লেকচারার নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে Realization of Tawhid, Abridgment of Sharh al Aquida Tahawiya, Studies in the Family in Islam and Islam and Sex সবগুলো গ্রন্থ আরবী ভাষায় রচিত।

Morals and Manners in Islam: A Guide to Islamic Adab হচ্ছে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামি আদব সংক্রান্ত বিধিবিধানের সংক্ষিপ্তসার। মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জনে আগ্রহী মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য এটা সংক্ষিপ্ত অথচ সমন্বিত পুস্তিকা। ইসলামি আইন শাস্ত্রের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই মুলতঃ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু গৃহীত এবং তা পয়েন্ট আকারে সাজানো হয়েছে। এটা প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের একটি প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই।